প্রহেলিকা-সিরিজ—১১ নং

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ
ফাল্গুন—১৩৫১

দাম—এক টাকা]

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

গল্পের আগে

আমার ছোট বোন্ শ্রীমতী প্রীতিসুধা সরকার (খুকু) খুব ছেলেবেলা থেকেই খুনোখুনি গল্প, ভূতুড়ে গল্প, ডাকাতের গল্প ইত্যাদি শুনতে বড্ড ভালোবাসতো। তার এই গল্পরূপ খোরাক যোগাতে হ'তো আমায়; কারণ, আমরা দু'জন পিঠাপিঠি ছিলুম ব'লে আব্দারটা আসতো আমার কাছেই। এর ফলে লাভ হয়েছিলো আমারই বেশী। মুখে মুখে গল্প বানাবার ক্ষমতা থেকে আমার লিখবার বাসনা হ'তে লাগলো এবং আমি লিখতেও লাগলুম।

প্রথম ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাসটা যখন লিখলুম তখন আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আমার ঐ উপন্যাস শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "পাঠশালা" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরুলো। উৎসাহিত হয়ে আমি আর একটা উপন্যাস লিখে ফেললুম। কিছুদিন ঐ উপন্যাস-খানা এমনি ভাবে পড়ে থাকবার পর আমার অগ্রজা শ্রীযুক্তা নিরুপমা বসু ও ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসুর অশেষ চেষ্টায় সে বইখানা বাজারে যেম্‌নি বেরুবার জন্য উন্মুখ হ'লো, ঠিক তেম্‌নি সময়ে দেশে কাগজের অনটন দেখা দিল। ফলে, বইখানা বেরুতে না পারায় আমার চাইতেও ওঁরা দু'জন দুঃখিত হলেন বেশী।

আজকে আপনারা যেটি পড়তে যাচ্ছেন সেটি আমার তৃতীয় বই। লিখেছি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে। কাঁচা হাতের লেখা; সবাইকে আনন্দ দিতে পারবে কি না জানি না। তবে এটা ঠিক যে, দুঃখিত দিদি ও জামাইবাবু এইবার খুশী হবেন নিশ্চয়। খুকু এখন বড় হয়েছে। এখন কি আর আমার লেখা তাকে আনন্দ দেবে ?

একজনের কথা উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে। সে আমার ছোট্ট বন্ধু শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার (মণি)। সত্যি, আমার সব কাজে তার সাহায্যের কথা ভোলা যায় না!

এইখানেই গল্প লেখা থামিয়ে দেবো না যদি শুনতে পাই যে যাঁরা গল্প পড়েন, তাঁরা আমার গল্পকে ভালোবেসেছেন।

সব শেষে নমস্কার রইলো শিশু-সাহিত্যিক শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি, যিনি আমার এই গল্পের একমাত্র প্রকাশক।

থানাঘাট,
ময়মনসিংহ

শ্রীতাপসরঞ্জন সরকার

আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

উৎসর্গীকৃত হইল

মাতঃ

শৈশবে ত্যজিয়া মোরে,
সহসা চলিয়া গেলা যবে ;
সেদিন হইতে মনে,
বলে কেবা সকরুণ রবে—
"মাতাকে বুঝিবি এবে,
ওরে তুই মাতার সন্তান !"
তাই তোমা বুঝিতেছি—
তুমি আছ হ'য়ে মোর প্রাণ !

দোল-পূর্ণিমা
১৩৫১ সাল

বিভু

একটি কনষ্টেবল লোকটির কাছে আগাইয়া গেল

[পৃঃ—৬৬

দরদী বন্ধু

এক

তেরশ' আটচল্লিশ সালের মাঘ মাস। কুয়াশাময় অন্ধকার রাত। গোয়েন্দা জিতেন্দ্রনাথ তাহার বালিগঞ্জের ত্রিতল অট্টালিকায় দিব্যি আরামে ঘুমাইতেছিল! হঠাৎ টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

জিতেন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে হাই তুলিয়া, একটু এপাশ-ওপাশ করিয়া, চোখ রগড়াইল। টাইমপিস্‌টার দিকে তাকাইয়া দেখিল, তিনটা বাজিয়া কয়েক মিনিট।

জিতেন্দ্রনাথ বিছানায় উঠিয়া বসিল, তারপর বাঁ-হাতে রিসিভার তুলিয়া লইয়া তন্দ্রাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যালো, কেও?"

ওদিক হইতে জবাব আসিল, "ঘুম ভাঙ্গলো তা'হলে? হ্যাঁ, আমি পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার সুধীর বসু। কথা কইছি ৫বি, সতীশ মুখার্জ্জি রোড থেকে। এখানে একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে। তোমাকে এক্ষুণি না এলেই চলছে না।"

জিতেন্দ্র একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, "এতো ভূমিকা রেখে

কাণ্ডটা কি, ছাই বল না! ভেঙ্গে তো দিয়েছো শেষরাতের আরামের ঘুমটাকে!”

সুধীর কহিল, “কিছু মনে করো না, কর্ত্তব্যের দায়ে বাধ্য হয়েই তো এসব করতে হয়; সে যাক্, তুমি শীগ্‌গির চলে এসো। এখানে একটা সাঙ্ঘাতিক খুন হয়ে গেছে!”

জিতেন্দ্রনাথ আরো বেশী বিরক্ত হইয়া ফোন নামাইয়া রাখিল।

শীতের আরামের রাত্রিতে যখন পৃথিবীর সকল প্রাণী নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়েই জিতেন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল একি হাঙ্গামা! আরামের লেপ ছাড়িয়া এখনি তাহাকে ছুটিতে হইবে কন্‌কনে ঠাণ্ডা ও কুয়াশার মধ্যে!

সরকারী চাকুরী মাত্রেরই নানা ফ্যাসাদ, বিশেষ করিয়া এই জিতেন্দ্রনাথের মত বড়-বড় গোয়েন্দাদের। জটিল কোন কেস্ হইলে তো কথাই নাই! এমন কি, যেগুলি সাধারণ কেস্, তাহাদেরও অন্ত নাই! জিতেন্দ্রনাথের প্রতিটি দিনেই এইরকম ফ্যাসাদ আর হাঙ্গামা! অতএব এক কথায় বলিতে গেলে, জিতেন্দ্রের জীবনটাই হাঙ্গামা আর ফ্যাসাদময়!

বিরক্ত হইয়া লেপটাকে বুকের উপর হইতে পায়ের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জিতেন্দ্র উঠিয়া হাঁক দিল, “বুদ্ধু, অ বুদ্ধু!”

পার্শ্বে অপর একটি শয্যায় শয়ান বুদ্ধদেব একটু নড়িয়া-চড়িয়া তাহার অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া আবার নির্জ্জীব হইল!

জিতেন্দ্র একটু হাসিয়া তাহার বুকের উপর হইতে লেপখানা টানিয়া সরাইয়া ফেলিল, তারপর কহিল, “উঠে পড়, কল্ এসেছে। দু'মিনিটের ভেতর রেডি হয়ে ন্যাও।” এই বলিয়া জিতেন্দ্র পাশের বাথ্‌রুমে প্রবেশ করিল।

আর সব সহ্য করা যায় কিন্তু শীতের রাত্রে গায়ের উপর হইতে লেপ সরাইয়া লইয়া গেলে আর অধিকক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকা চলে না। অতএব বুদ্ধদেবকে উঠিতেই হইল।

খানিক পরেই নিস্তব্ধ রাজা বসন্ত রায় রোডটিকে সচকিত করিয়া জিতেন্দ্রনাথের গাড়ীখানা সতীশ মুখার্জ্জি রোডের দিকে ছুটিয়া চলিল।

রাসবিহারী এভিনিউয়ের মোড়ে গাড়ীখানা আসিতেই হঠাৎ রাস্তার অপরদিক হইতে আর-একখানা গাড়ী হুড়মুড় করিয়া জিতেন্দ্রের গাড়ীর প্রায় উপরে আসিয়া পড়িতে-পড়িতে ব্রেক কসিয়া সশব্দে থামিয়া পড়িল!

জিতেন্দ্র নিজের গাড়ীখানা থামাইয়া ফেলিয়াছিল। অপর গাড়ীখানা থামিতেই সে রাগিয়া কহিল, "এতো রাতে কে এমন বেহিসাবী হয়ে গাড়ী চালাচ্ছে? নম্বরটা টুকে নাও তো বুদ্ধু!"

কিন্তু বুদ্ধদেবকে শীতের ভিতর আর নামিতে হইল না। সেই গাড়ীর মধ্য হইতে কে যেন কহিয়া উঠিল, "নম্বর টুকবার জন্য নাবতে হবে না, আমি নিজেই আসছি!" এই বলিয়া একটি দীর্ঘাকৃতি লোক গাড়ী হইতে নামিয়া জিতেন্দ্রের গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

হঠাৎ জিতেন্দ্র সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আরে অমিয় যে! তুই এতো রাতে চলেছিস কোথা? 'ব্ল্যাক আউটের' অন্ধকার, একদম চিনতে পারিনি!"

অমিয় উত্তর দিল, "আমি কিন্তু তোর গলার আওয়াজ পেয়েই চিনতে পেরেছি। কিন্তু তুই-ই বা এতো রাতে সসঙ্গী যাচ্ছিস কোথায়?"

জিতেন্দ্র উত্তর দিল, "আমার কথা আলাদা! আমি হলেম

গোয়েন্দা মানুষ। আজ দেখবি ভাল মানুষটি, কাল হয়তো পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি! কি বলিস?"

দূর হইতে পাহারাওয়ালার চীৎকার শোনা গেল। সে দৌড়াইয়া কাছে আসিয়া কহিল, "এত্না রাতমে ইধার মোটর খাড়া কিয়া হ্যায় কিস্‌কা আস্তে জী? আপলোগেনকো নম্বর দেনে পড়েগা।"

জিতেন্দ্র গলা বাড়াইয়া কহিল, "কোন্, রামদীন?"

রামদীন জিতেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া কহিল, "সেলাম জী! হাঁ, ম্যয় রামদীন হো। মাপ কি জিয়ে জী, আন্ধার মে তো মেরা মালুম হুয়া নেই!" কহিতে কহিতে রামদীন দূরে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

জিতেন্দ্র কহিল, "তারপর, এতো রাতে ফিরছিস কোত্থেকে?"

অমিয় উত্তর দিল, "ইনভাইট্ করতে-করতেই রাত একটা হয়ে গেল। একটার পর গিয়ে সলিলকে ডেকে তুললুম। সে বেচারা নাছোড়বান্দা; বললে, 'ঘুম যখন ভাঙ্গালিই তখন একটু বসে জিরিয়েই যা।' ব্যস, যেই বসা, অমনি তর্‌তর্ করে রাত তিনটে! একরকম জোর করেই চলে এলাম। কিন্তু তোমার গমন হচ্ছে কোথায়?"

জিতেন্দ্র কহিল, "কোথায় আবার? খুনের তদারকে।"

অমিয় অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "খুন!"

জিতেন্দ্র কহিল, "কেন, ভয় পেলি নাকি?"

অমিয় কহিল, "ভয় পাবো না! এতো রাতে খুন? আমি চললুম বাবা, নমস্কার! ওঃ ভাল কথা,—কাল পাঁচটার ভেতরেই যাস কিন্তু। খুনের কথাটাও তখন শোনা যাবে।" একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয়র গাড়ীখানা অন্ধকারের ভিতরে মিশিয়া গেল।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দেবার সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিল, "কাল পাঁচটার সময় উনি কোথায় যেতে বললেন ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "দেখেছো, তোমাকে বলাই হয়নি ! অমিয় বিলেত থেকে 'ডক্টর অব সায়েন্স' উপাধি পেয়ে এসেছে, তাই কাল ওর বাড়ীতে 'পার্টি'। তোমাকেও যেতে হবে। আজকে দুপুরে ও নিজে এসে বলে গেছে। বেচারা নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে রাত তিনটেয় বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।"

বুদ্ধদেব কহিল, "উনি তো বিলেত থেকে ফিরেছেন একমাস হয়ে গেছে। পার্টি এদ্দিন পরে যে ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "ওর কোন্ এক আত্মীয় মারা গেছে। পরশু অশৌচ কেটে গেছে। এর জন্যই দেরী হোল।"

গাড়ী এই সময় সতীশ মুখার্জ্জি রোডে অন্ধকারময় একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুধীর নিজে আগাইয়া আসিয়া কহিল, "যাক, সময়মতই এসে পড়েছিস্ !"

জিতেন্দ্র কহিল, "বাসা চিনে যে আসতে পেরেছি, তাই যথেষ্ট।"

একটা শেওলা-পড়া সাদা রং-এর সরু দোতালা দালান। তাও আবার বাড়ীখানা ভাড়াটে। নীচের ফ্ল্যাটে একটা মাঝারী গোছের মুদীর দোকান। উপরের ফ্ল্যাটই জিতেন্দ্রের গন্তব্য স্থল। সেটি এক নামজাদা বোটানির প্রফেসারের বাসা। ভদ্রলোক তাঁহার এক সম্বন্ধীর সঙ্গে বাস করেন। বাড়ীতে একটি পাচক ঠাকুর আছে, সে-ই রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ নির্ব্বাহ করে।

সুধীরের মুখে এই সকল কথা শুনিতে-শুনিতে জিতেন্দ্র উপরে উঠিতেছিল। এইবার কহিল, "হ্যাঁ, তাতো বুঝলুম, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে, তাই বল না কেন ?"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ, বল্‌ছি। আজকে রাতেই কে যেন ঐ প্রফেসারকে খুন করে চলে গেছে! কিন্তু খুনটা কিছু বিশ্রী রকম। প্রফেসারের গলাটি কাটা—অর্থাৎ ধড় আছে, মাথা নেই!"

জিতেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, "মাথা নেই?"

সুধীর কহিল, "না, মাথা পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের অনুমান—আততায়ী তাঁর মাথা নিয়ে সরে পড়েছে।"

দুই

জিতেন্দ্র ও বুদ্ধদেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

দোতালায় পাশাপাশি তিনটি শোবার ঘর। এক পাশে একটা ছোট রান্নাঘর এবং দুইটি বাথ-রুম। বড় ঘরটিতেই বিছানার উপর প্রফেসার মহাশয়ের মস্তকহীন মৃতদেহটা পড়িয়া আছে। সারা বিছানা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে; এমন কি, রক্তের স্রোত বিছানা ছাড়িয়া মেঝেতে পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিয়াছে। স্পষ্ট বুঝা যায়, গলাটি এক কোপে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে!

তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের কোপ শুধু গলাটি কাটিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিছানার চাদর ও তোষকের কতকাংশও কাটিয়া ফেলিয়াছে। শ্যালক শ্রীমান্ বিজনকুমার হতভম্বের মত খাটের একপাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখে এখন আর জল নাই, বোধ হয় অঝোর-ধারায় ঝরিয়া চোখের জল এখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

জিতেন্দ্র তাহার কাছে আগাইয়া গেল, এবং কহিল, "ইনিই তোমার জামাইবাবু?"

বিজন মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"চিনতে পারছো কেমন করে?"

"গায়ের জামাটা দেখে।"

"তুমিই থানায় ফোন করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়ীতে ফোন আছে ?"

"হ্যাঁ, আছে ; জামাইবাবু আনিয়েছিলেন, তাঁর দরকার হত।"

"যখন ফোন কর তখন রাত ক'টা ?"

"রাত তখন দু'টোর ওপরে !"

"তুমি কোন্ ঘরে শোও ?"

"ঐ পাশের ঘরে।"

"রাত দু'টোর সময় তোমার ঘুম ভাঙ্গলো কেন ?"

"ঘড়িতে এলার্ম্ম দিয়ে রেখেছিলাম।"

"রাত দু'টোর সময় এলার্ম্ম ?"

"হ্যাঁ, জামাইবাবুকে রোজ রাত দু'টোর সময় তুলে দিতে হোত ! উনি বোটানি নিয়ে রিসার্চ্চ করছিলেন এবং একটা গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখছিলেন। ইউনিভারসিটিও তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। সকালে সময় হত না, তাই রাত দু'টো থেকে ভোর ছ'টা অবধি তিনি লিখতেন। রাত্রে আমিই তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিতুম। আজকে উঠে এসে দেখি, দোর খোলা ; ঘরে তিনি এমনি ভাবে পড়ে রয়েছেন।"

জিতেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোন্ ঘরে বসে প্রবন্ধ লিখতেন ?"

বিজন পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া কহিল, "এই ঘরে।"

জিতেন্দ্র, বুদ্ধদেব ও সুধীর বিজনের পেছনে-পেছনে ঐ ঘরে প্রবেশ করিল।

জিতেন্দ্র লক্ষ্য করিল, ঘরখানির চারিদিকে একটা লম্বা কাঠের গ্যালারীর মত জিনিষ। তাহার উপর নানাজাতীয় তৃণ, গুল্ম ও ফুলের টব সারি-সারি সাজান রহিয়াছে।

কোন গাছে টাট্‌কা ফোটা ফুল ও কোন গাছে কলি ধরিয়া আছে। কোন-কোন গুল্মের টবগুলি কাচের। গাছের শিকড়-গুলি ক্রমশঃ কি ভাবে বিস্তৃতিলাভ করে, তাহা যাহাতে দেখা যায়, সেই উদ্দেশে কোন-কোন গাছের টবগুলি কাচের তৈয়ারী। প্রত্যেকটি গাছের গায়ে লেবেল আঁটিয়া নম্বর ও নাম লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালের গায়েও এইরকম অসংখ্য ফুল, পাতা, ফল ও তরি-তরকারির ছবি টাঙানো রহিয়াছে। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বাক্সে ঢাকা একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত, এবং টেবিলের উপর ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে নানারকম কাচ ও চীনামাটির খুঁটিনাটি জিনিষপত্র।

একটা ছোট গাছের দিকে জিতেন্দ্রের নজর পড়িল। গাছটিতে তখনও লেবেল আঁটা হয় নাই। গাছটির দুই পাশে দুই রকম পাতা!

জিতেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি গাছ?"

বিজন আগাইয়া আসিয়া গাছটিতে হাত দিয়া কহিল, "এ একটা বিলিতী ফুলগাছ ও একটা দেশী ফুলগাছ মাঝখানে চিরে সূতো দিয়ে বেঁধে এই টবের ভেতর পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এই গাছে একটা আশ্চর্য্য ফুল হবে দেশী ও বিলিতী মেশানো। জামাইবাবু বলেছিলেন, তিনি এর নাম রাখবেন ইণ্ডিপিয়ান ফ্লাওয়ার অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান-এর 'ইণ্ডি' এবং ইউরোপিয়ান-এর 'পিয়ান'! দু'টোর কাণ্ড এখনো যোড়া লাগেনি। যোড়া লাগলে পরে এ পাতা ঝরে পড়ে যাবে এবং আর-একরকম নতুন পাতা গজাবে।"

জিতেন্দ্র বিজনের উত্তর শুনিয়া বেশ খুশী হইয়া কহিল, "তোমার জামাইবাবু তা'হলে খুব পণ্ডিত ও বেশ মাথাওয়ালা।

লোক ছিলেন, কি বল? তিনি কলেজে বেতন পেতেন কত?”

বিজন উত্তর দিল, “আড়াই শো; ইউনিভারসিটি থেকেও তিনি দু'শো টাকার একটা এ্যালাউন্স পেতেন।”

জিতেন্দ্র কহিল, “আচ্ছা, তাঁর সেই প্রবন্ধ লেখা কতদূর হয়েছিল?”

বিজন কহিল, “অর্দ্ধেকেরও বেশী হয়েছিল। অর্দ্ধেকটা তিনি ইউনিভারসিটিতে দিয়ে এসেছিলেন। বাকী অর্দ্ধেকটা লিখছিলেন।”

জিতেন্দ্র সহসা প্রশ্ন করিল, “আচ্ছা, হঠাৎ তাঁর মাথা কাটা গেল কেন বলতে পার?”

সে উত্তর দিল, “আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!”

“ওঁর কোন শত্রু ছিল বলে তোমার মনে হয়?”

বিজন কহিল, “তাও আমি বলতে পারি না।”

“কারো সাথে কোনদিন বাদানুবাদ হতে দেখেছ?”

“না।”

“কাল রাতে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন?”

“না।”

“রাত্রে কখন শুতে গিয়েছিলেন?”

“ঠিক সাড়ে দশটায়।”

“অন্যান্য দিন ক'টার সময় বিছানায় শুতেন?”

“ঠিক এইরকম সময়েই।”

“তোমার জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধবদের তুমি চেন?”

“অনেককেই চিনি।”

জিতেন্দ্র প্রফেসারের বোটানিক্যাল রুম পরিত্যাগ করিয়া মৃতদেহের ঘরে আসিল। একখানা চেয়ার লইয়া বসিয়া

কহিল, "আচ্ছা বিজন, তুমি যখন তোমার জামাইবাবুকে ডাকতে আস তখন এই ঘরের দোর খোলা ছিল ?"

বিজন কহিল, "হ্যাঁ।"

সহসা জিতেন্দ্র ঘরের মেঝের দিকে তাকাইয়া বুদ্ধদেবকে কহিল, "বুদ্ধ, এই যে ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ ঘর থেকে চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে চলে গেছে, তুমি এ দাগটা একটু ভাল করে দেখে এস তো কোন্ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় !"

বুদ্ধদেব রক্তের দাগ লক্ষ্য করিতে-করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট দুই পর ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "নীচতলার সিঁড়ির শেষ অবধি দাগটা পাওয়া যায়। এর পর সদর রাস্তা, কিন্তু রাস্তায় এক ফোঁটা দাগ নেই।"

জিতেন্দ্র কোন কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তারপর টর্চ্চের আলোকে সারা পথ ও তার আশপাশের সমস্ত জায়গা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। একটু পর নিজের মনেই কহিল, "হুঁ।"

বুদ্ধদেব কহিল, "হুঁ কি ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "আততায়ী মোটরে করে এসেছিল ; কাটা মাথাটা সিঁড়ির শেষ প্রান্ত অবধি হাতে করে এনে তারপর মোটরে চাপিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। রাস্তায় মোটরের চাকার দাগ পাওয়া যাচ্ছে।"

জিতেন্দ্র আবার সেই ঘরে ফিরিয়া গেল। খোলা দরজার দিকে তাকাইয়া কহিল, "এই দোরটাই খোলা ছিল, নয় বিজন ?"

বিজন কহিল, "হ্যাঁ।"

হঠাৎ জিতেন্দ্র উপুড় হইয়া খাটের নীচটা দেখিল ;

তারপর কহিল, "প্রফেসার মশাই শোবার সময় ঘর-দোর ভাল কোরে লক্ষ্য করে শুতেন ?"

বিজন কহিল, "না, সে রকম ভাবে দেখে-শুনে বোধ হয় তিনি শুতেন না। তিনি একটু অসাবধানী ছিলেন।"

জিতেন্দ্র শুধু কহিল, "হুঁ।"

বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিল, "হুঁ কি ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "খাটের নীচে মানুষের পূর্ব্ব-অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।"

বুদ্ধদেব উপুড় হইয়া দেখিল যে, সত্য-সত্যই খাটের নীচে মানুষের হাত ও পায়ের দাগ রহিয়াছে। ঘরের মেঝেতে ঝাঁট দেওয়া হইত বটে কিন্তু খাটের তলায় পেছনদিকে ঝাঁট পড়িত না। তাই সেখানে একরকম সাদাটে ধূলো জমিয়া গিয়াছিল। সেই ধূলো লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, খাটের তলায় নিশ্চয়ই কেহ লুকাইয়া ছিল। সেই গোপন লোকটির হাত-পায়ের ছাপ পর্য্যন্ত তাহাতে লাগিয়া রহিয়াছে !

জিতেন্দ্র কহিল, "হয় আততায়ী নিজে, নয় তার অনুচর খাটের নীচে আত্মগোপন করে ছিল। যাক্, আমার কাজ হয়ে গেছে। লাস তোমার জিম্মায় রইল সুধীর, আমি চললুম ; হ্যাঁ, এ কেস্‌টার তদন্তের ভার আমিই নিলুম। আপাততঃ আমার হাতে অন্য কোন কেস্ নেই। খাতায় আমার নাম লিখে রেখো। আচ্ছা আসি তা'হলে আজকের মত। বিজন, তুমি ভয় পেয়ো না, সুধীর তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

এত শীঘ্র জিতেন্দ্রের বিদায় লইবার কারণ এই যে, মৃত ব্যক্তির খাট পরীক্ষা করিবার সময় খাটের উপর সে এক টুকরা ভাঙ্গা নীলাভ পাথর দেখিতে পাইয়াছিল এবং উহাকেই রহস্য-উদ্ধারের একটা মূল্যবান্ সূত্র ভাবিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের পকেটে পূরিয়া লইয়াছিল।

তিন

আস্তে-আস্তে শীতের সেই অন্ধকারময় রাত্রি ভোরবেলার স্বচ্ছ আলোর ভিতর হারাইয়া গেল। ধরণীতে সূচিত হইল আবার সেই নব-জাগরণের ব্যস্ততা···

বাড়ী ফিরিয়া বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিল, "কেস্‌টা জটিল বলেই মনে হচ্ছে, নয় জিতুদা ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, কেস্‌টা একটু নতুন রকমের, অর্থাৎ এরকম কেস্ আমার হাতে পড়েছে কম। তুমি তোমার কাজে যাও, আমাকে নিঃশব্দে ভাবতে হবে বিছুক্ষণ।" কহিয়া জিতেন্দ্র তাহার চাকর রমেশকে চায়ের হুকুম দিয়া ইজি-চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া ধীরে-ধীরে চক্ষু মুদিয়া ফেলিল।

জিতেন্দ্র যখন আবার ধীরে-ধীরে চোখ খুলিল, তখন রমেশ ট্রেতে করিয়া চা ও খাবার লইয়া আসিয়াছে। পাশের ঘর হইতে বুদ্ধদেব বাহির হইয়া আসিয়া কেত্‌লী হইতে কাপে চা ঢালিয়া জিতেন্দ্রের দিকে আগাইয়া দিল। জিতেন্দ্র সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "হুঁ।"

বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "হুঁ কি, জিতুদা ?"

জিতেন্দ্র চায়ের পেয়ালায় একবার চুমুক দিয়া কহিল, "আচ্ছা বুদ্ধদেব, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও তো!"

বুদ্ধদেব কহিল, "বল।"

জিতেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "প্রফেসারের বাড়ীতে মাথাটা ফেলে না-রাখাই আততায়ীর উদ্দেশ্য, না সাথে করে নিয়ে যাওয়াই তার মতলব ?"

বুদ্ধদেব একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "আমার মনে হচ্ছে মাথাটা সাথে করে নিয়ে যাওয়াই আততায়ীর উদ্দেশ্য।"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়; কারণ, এখানে মাথাটা থাক্ বা না-থাক্, মৃতদেহ সনাক্তের কোন অসুবিধাই হতে পারে না। কাজেই তা'হলে বলতে হচ্ছে যে, মাথাটা নেবার জন্যই আততায়ী প্রফেসার মশাইকে খুন করেছে অর্থাৎ কি না, মাথাটা দিয়ে আততায়ী কোন কাজ করবে, কি বল?"

বুদ্ধদেব কহিল, "কিন্তু রাজ্যের এত লোক থাকতে সামান্য একটা প্রফেসারের মাথাটা নিয়ে গেল, এটা একটু কেমন-কেমন ঠেকছে না?"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভুল বললে বুদ্ধ, অন্য কারো মাথা নিলেও তুমি এই কথাই বলতে! কিন্তু ঐ যে কি বললে তুমি,—ও হ্যাঁ, সামান্য,—একথাটা বলা তোমার ভুল হয়েছে; অর্থাৎ প্রফেসার সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁর লেখা থিসিস্‌খানা—মানে প্রবন্ধটি বেরোবার সাথে-সাথেই তাঁর অসামান্যতা বেরিয়ে পড়তো।"

বুদ্ধদেব কহিল, "কিন্তু তাঁর এই অসামান্যতার সাথে এই খুনের কি সম্বন্ধ রয়েছে? বাড়ীতে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি পড়ে রয়েছে; এমন কি, বাড়ী থেকে এক টুকরো কাগজ অবধি খোয়া যায়নি! এর চেয়ে প্রফেসারকে যদি জীবন্ত ধরে নিয়ে যেতো, তা'হলে এই অসামান্য লোকটিকে দিয়ে আততায়ী নিজের কোন কাজ করিয়ে নিতে পারতো।"

জিতেন্দ্র কহিল, "তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে প্রফেসারের অসামান্যতার সাথে তাঁর খুনের কি সম্বন্ধ রয়েছে!"

বুদ্ধদেব একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি বুঝতে পারছো ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ পারছি, কিন্তু এখনো তা প্রকাশের সময় হয়নি।"

বেলা দশটার সময় ইন্‌স্পেক্টার সুধীর বসু একটু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জিতেন্দ্রের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত।

জিতেন্দ্র কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি সুধীর ? এতো ব্যস্ততা !"

সুধীর একটা কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "ব্যাপার বড় সাঙ্ঘাতিক ! আবার খুন—দু'টো ! একই সময়ে একই রকম !"

জিতেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, "ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে গুছিয়ে বলতো ?"

সুধীর কহিতে লাগিল, "আমি প্রফেসারের বাড়ী থেকে থানায় ফিরে গিয়েই এই খবর পাই। কাল রাত একটার সময় বড়বাজারে এক মাড়োয়ারী মহাজনের ঘরে এক বাঙ্গালী গোমস্তা খুন হয়েছে। তাঁরও গলাটা কাটা—অর্থাৎ ধড় পড়ে আছে, মাথা নেই ! আর ঠিক এই রকম সময়েই কলেজ ষ্ট্রীটে আর একজন লোকও এই রকম ভাবেই খুন হয়েছে। তারও ধড় পড়ে আছে, মাথা নেই !"

জিতেন্দ্র কহিল, "প্রথম ব্যক্তি দোকানের একজন গোমস্তা ?"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ, গোমস্তা। ও মারা যাওয়ায় দোকানের মালিকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বেচারা ভীষণ হা-হুতাশ করছে।"

জিতেন্দ্র উৎসুক হইয়া কহিল, "কেন ?"

সুধীর কহিল, "ঐ গোমস্তাকেই দোকানের সব হিসেব করতে হোত। মুখে-মুখেই সে বড়-বড় জটিল হিসেব করে ফেলতো। দোকানের মালিক বলছেন যে, ওর মত হিসেবে অভিজ্ঞ লোক নাকি সারা কোলকাতায় দু'টি নেই! বেশী মায়না দিয়েও মালিক ঐ গোমস্তাটিকে কাজে বাহাল রেখেছিল। সুতরাং ওর এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মালিকের যে অত্যন্ত ক্ষতি হোল, তাতে আর সন্দেহ নেই!"

জিতেন্দ্র কহিল, "যাক, কলেজ ষ্ট্রীটে যে খুন হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু জান ?"

সুধীর কহিল, "হ্যাঁ, তিনি নাকি একজন বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি শূন্যর দাম কত, (value of zero) বার করবার জন্য মাথা ঘামাচ্ছিলেন !"

জিতেন্দ্র কহিল, "ব্যস্, ওতেই হবে।"

সুধীর আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ওতেই হবে মানে ?"

জিতেন্দ্র সে কথার উত্তর না দিয়া হাসিয়া কহিল, "বুঝলে বুদ্ধ, যা আমি অনুমান করেছিলাম ঠিক তাই। এই তিনটি খুনের মূলে একই ব্যক্তি এবং একই কারণ।"

বুদ্ধদেব কহিল, "মানে ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "তিনজনেই খুব বড় মাথাওয়ালা লোক ছিলেন, একথা স্বীকার কর তো ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "সুধীরবাবুর কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।"

জিতেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, এখন এই তিনটি ব্যক্তিরই মাথা অদৃশ্য হয়েছে, তাও স্বীকার কর তো ?"

সুধীর ও বুদ্ধদেব উভয়েই কহিল, "আলবৎ !"

জিতেন্দ্র কহিল, "অতএব, এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে তিনটি তীক্ষ্ণ মেধাবীর মাথা আততায়ী সংগ্রহ করেছে। একথা তোমাদের স্বীকার্য্য ?"

তাহারা কহিল, "হ্যাঁ।"

জিতেন্দ্র কহিল, "মাথা তিনটি নিয়ে আততায়ী নিশ্চয় আলমারীতে সাজিয়ে রাখবে না অথবা কোন প্রদর্শনীতেও পাঠিয়ে দেবে না! কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাথা তিনটি সে কোন কাজে ব্যবহার করবে। কেমন, তাই কি না ?"

তাহারা কহিল, "হ্যাঁ।"

জিতেন্দ্র কহিতে লাগিল, "এখন দেখতে হবে মাথার ভেতর কি আছে! চুল, রক্ত, মাংস এবং হাড় যে আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কি বল ? আচ্ছা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে চুল, রক্ত এবং হাড়-মাস প্রত্যেক লোকের মাথায়ই আছে। আততায়ীর যদি এই জিনিষগুলোরই দরকার হোত, তা'হলে সে কখ্খনো তীক্ষ্ণ মাথাওয়ালা এই তিনটি লোকের সর্ব্বনাশ করতো না; অতএব এখন পরবর্ত্তী চিন্তার দিকে এগোও।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চুল, রক্ত এবং হাড়-মাস ছাড়া মস্তকে আরো একটি জিনিষ আছে, যার নাম হচ্ছে মগজ। এখানেই হচ্ছে একটা বিশেষ বিবেচনার কথা। কথাটি হচ্ছে এই যে, সকল মানুষের মগজ এক রকম নয়। বুদ্ধিহীন ব্যক্তির মগজের চাইতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মগজের দাম অনেক বেশী। যেমন ধর,—রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আশু মুখুজ্জে, অরবিন্দ, কবি গেটে, শেলী, এমন কি বিখ্যাত ডিটেকটিভ রায় যোগীন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি লোকের মগজের দাম রাম-শ্যামের মগজের চাইতে অনেক বেশী। এক কথায় বলতে গেলে, সাধারণ লোকের মগজ আর ঐ-সকল

লোকের মগজের ভেতর পার্থক্য অনেক। আমার ধারণায় এই তিনটি লোকও সাধারণ লোকের স্তর অপেক্ষা অনেকটা উচ্চে। এই তিনটি লোকের মগজও সাধারণ লোকের মগজের চেয়ে বেশী দামী।

প্রত্যেক মগজের দু'টো অংশ আছে। একটাকে বলে 'সেরিব্রাম্' অপরটাকে বলে 'সেরিবিলাম্'; সেরিব্রাম্ দেখেই বোঝা যায়, কে কিরকম বুদ্ধিমান্ বা চিন্তাশীল। সেরিব্রাম্‌কে বাংলায় বলে বৃহৎ মস্তিষ্ক। এই বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরিভাগটা সমতল নয়, অসমতল—অর্থাৎ ঢেউতোলা। যাঁর বৃহৎ মস্তিষ্ক যত বেশী ঢেউতোলা, সে তত বেশী বুদ্ধিমান্। যাদের নাম উল্লেখ করলাম, তাদের সবারই বৃহৎ মস্তিষ্ক বেশী মাত্রায় ঢেউ তোলানো। যাক, এখন আসল কথায় ফিরে এসো।

আততায়ী এই তিনটি লোকের মাথা নিয়েছে; কারণ, সে এই তিনটি লোকের মগজ চায়। মগজ নিয়ে সে কি করবে, তা অবশ্য অনুমান করতে পারছি না। তবে একটা বড় রকম যে কিছু করবে, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। মানুষের মগজ নিয়ে যার কারবার, সে কখনই একটা যা-তা লোক নয়! কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, সে অতিমাত্রায় শিক্ষিত এবং সেই সঙ্গে সাঙ্ঘাতিক!"

জিতেন্দ্র চুপ করিল। সুধীর কহিল, "তা'হলে দেখছি তুমি ভীমরুলের চাকে হাত দিতে যাচ্ছ!"

জিতেন্দ্র কহিল, "তা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। তবে আততায়ী যে ভদ্রবেশী জোচ্চোর এবং সে যে ভদ্রসমাজেই বাস করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন কে সেই মহাত্মা, তা খুঁজে বের করতে হবে।"

চার

জিতেন্দ্রের বন্ধু অমিয়র নতুন বাড়ীখানা গরিয়াহাটার কাছাকাছি একটা ফাঁকা মাঠের একাংশে অবস্থিত। যদিও জিতেন্দ্রের বাড়ী হইতে অমিয়র বাড়ী খুব বেশী দূরে নহে, তথাপি জিতেন্দ্রের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত অমিয়র বাড়ী দেখা ঘটিয়া ওঠে নাই। ইহার কারণ দুইটি।

প্রথমতঃ জিতেন্দ্রকে কাজ লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, তাহার পক্ষে সময় করিয়া লইয়া বন্ধুর বাড়ী দেখা সম্ভব হইয়া ওঠে না। দ্বিতীয়তঃ বলা যাইতে পারে যে, এ-বিষয়ে জিতেন্দ্রের ঔৎসুক্যও বড় একটা বেশী ছিল না। সে যাহা হউক, আজ যখন সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে পার্টিতে যাইতে হইবেই।

বিকাল সাড়ে-চারিটা বাজিলে পর জিতেন্দ্র বুদ্ধদেবকে লইয়া গাড়ীতে চাপিয়া অমিয়র বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। অমিয় দোতলা হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেল।

দোতলার ঠিক মধ্যস্থলে একটা হল্‌-ঘরের মত বড় ঘর। চেয়ার টেবিল দিয়া ঘরটি বেশ ভাল করিয়া সাজান হইয়াছে। ঘরের চারি কোণে চারিটা বড়-বড় সুদৃশ্য ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে। তাহাতে কুড়ি-বাইশটা করিয়া মোমবাতি বসান।

জিতেন্দ্র সেই দিকে তাকাইলে, অমিয় আসিয়া হাসিয়া কহিল, "আজ রাতে আর ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলবে না; সে স্থান অধিকার করবে এই ঝাড়-লণ্ঠন।"

জিতেন্দ্র হাসিল, কহিল, "তোমার রুচিতে বৈশিষ্ট্য আছে।"

চারিদিকে চীনদেশীয় ঝালর—প্রতি টেবিলের উপর একটি করিয়া সোনালী বর্ডার দেওয়া চীনা-মাটির ফুলদানী—তাহাতে সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ। দামী ধূম-কাঠির মন-মাতানো গন্ধে ঘরখানি আমোদিত হইয়া আছে।

অমিয়র বন্ধু-বান্ধব অনেকেই উপস্থিত হইয়াছে। সকলেরই পোষাক-পরিচ্ছদে একটা কমনীয় সুষমা। মাঝখানে কয়েকটি তক্তপোষ একত্রিত করিয়া তাহার উপর ইরানি গালিচা পাতা হইয়াছে। সেখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সাজানো। সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে একটা অকৃত্রিম আনন্দের মৃদুমন্দ তরঙ্গ! দেখিতে-দেখিতে গণ্যমান্য বিখ্যাত ওস্তাদ ও গায়কদিগের গীতি-ঝঙ্কারে সমগ্র আসর মুখরিত হইয়া উঠিল—পৃথিবীর বুকে যেন স্বর্গের সুষমা ও স্বর্গের রাগিণী ফুটিয়া উঠিল!

কিছুক্ষণ সকলেই তাহাতে আত্মহারা—সকলেই মশগুল! তারপর ধীরে-ধীরে সমস্তই নীরব হইয়া আসিলে জিতেন্দ্রের যেন চমক ভাঙ্গিল! সে অমিয়কে কহিল, "আজকে যখন আসা হোলই তখন তোর নতুন বাড়ীখানা আর একবার ঘুরে দেখে যাই। কি বলিস?"

অমিয় কহিল, "বিলক্ষণ! আমিও ভাবছিলুম, তোকে বাড়ীখানা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবো। আয়!"

জিতেন্দ্র ও বুদ্ধদেব অমিয়র সাথে-সাথে সারাটা বাড়ী ঘুরিয়া দেখিল। বাড়ীখানাকে এক কথায় বলা চলে, চমৎকার! আশিহাজার টাকার উপর খরচ পড়িয়াছে, অতএব ভাল হইবারই কথা। বিশেষতঃ অমিয়র ন্যায় বিলেত-ফেরৎ ফ্যাসন-দুরস্ত ছেলের বাড়ীর ষ্টাইলটা একটু অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

সারা বাড়ীটা দেখিতে-দেখিতে এক জায়গায় একটি কক্ষের দরজা বন্ধ দেখিয়া জিতেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "এ ঘরটা বন্ধ কেন?"

অমিয় কহিল, "এটা অব্যবহার্য্য। বাড়ীর যত আবর্জ্জনার স্থান এই কক্ষে।"

জিতেন্দ্র একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "আবর্জ্জনার স্থান হওয়া উচিত তো আস্তাকুঁড়ে! তা না হয়ে এই সুন্দর ঘরটাতে—"

অমিয় কহিল, "কি জান, কোন জিনিষ ফেলে দিই এটা পিসীমা পছন্দ করেন না।"

অমিয়র সংসারে একমাত্র তাহার পিসীমাই বিদ্যমান। পিসীমাকে লইয়া সে তাহার স্বর্গগত পিতার অগাধ টাকার সদ্ব্যবহার করিতেছে। সম্প্রতি পিসীমা দেশের বাড়ীতে গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

অমিয়র কথা শুনিয়া জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "মানুষের বয়সের সাথে-সাথে জিনিষের প্রতি মমতা অনেকটা বেড়ে যায়! কি বলিস?"

অমিয় মৃদু হাসিয়া কহিল, "যথার্থ।"

জিতেন্দ্র কহিল, "তোর ল্যাবরেটরী বুঝি এখনো তৈরী হয়নি?"

অমিয় কহিল, "বিলেতে জিনিষ-পত্তরের অর্ডার পাঠিয়েছি, এখনো এসে পৌঁছায়নি। এলে, আবর্জ্জনা সরিয়ে ঐ ঘরটিকেই আমার ল্যাবরেটরীতে পরিণত করবো।"

জিতেন্দ্র কহিল, "বেশ হবে, তখন তোর এখানে আমাকে মাঝে-মাঝে এক্সপেরিমেণ্টের জন্য আসতে হবে। জানিস তো, আমার ল্যাবরেটরীটা অনেকগুলো জিনিষের অভাবে পঙ্গু হয়ে আছে!"

অমিয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "পঙ্গু হয়ে আছে, তার মানে? তুই বিলেত থেকে আনিয়ে নিচ্ছিস্ না কেন?"

জিতেন্দ্র কহিল, "আনিয়ে নে বললেই তো আর আনা যায় না! আসল কথা হচ্ছে, আমার যে জিনিষগুলোর প্রয়োজন, বর্ত্তমানে এই দুর্দ্দিনে বিলেতেও সেগুলো তৈরী হচ্ছে না। অতএব কি আর করা যাবে?"

অমিয় তাড়াতাড়ি কহিল, "তা'হলে তো আমার অর্ডারের সব জিনিষও এসে পৌঁছবে না!"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "তা'হলে তোর এখানে এসে আমারও আর এক্সপেরিমেণ্ট করা ঘটে উঠলো না, কি বলিস?"

সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার সাথে-সাথেই ঝাড়-লণ্ঠনের সমস্ত মোমবাতিগুলি সারি-সারি জ্বলিয়া উঠিল। এ যেন ঠিক শ্যামাপূজার রাত্রের দীপালীর আলোক-বিচ্ছুরণ! সারাটা বাড়ীতে সন্ধ্যার সাথে-সাথেই আরম্ভ হইল দীপালোকের অফুরন্ত মহোৎসব!

জিতেন্দ্র কহিল, "এবার বিদেয় হতে হয়।"

অমিয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এখুনি? তোর কালকের সেই খুনের ইতিহাস বলবি না?"

জিতেন্দ্র কহিল, "তুই যা ভীতু, এসব তোর পোষাবে না। শুধু শুনে রাখ, কাল রাত্রে তিনটি খুন হয়েছে আর তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর।"

অমিয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "এক রাত্রে তিনটে খুন? এই কোলকাতা সহরের বুকে?"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "জানিস, প্যারিসে কয়েক বছর আগে এক রাত্রে চল্লিশটি খুন হয়েছিল! সেই তুলনায় তিনটে খুন বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের নয়!"

হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকাইয়া জিতেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "পৌনে সাতটা হোল। অমিয়, আমাকে এখ্‌খুনি যেতে হবে। একটা জরুরী কাজ আছে।" এই বলিয়া জিতেন্দ্র আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া অমিয়র বাড়ী ত্যাগ করিল।

গাড়ীর ভিতর বসিয়া জিতেন্দ্র বুদ্ধদেবকে কহিল, "সলিলকে তো পার্টিতে দেখতে পেলুম না!"

বুদ্ধদেব কহিল, "আমিও দেখিনি। বোধ হয় উনি আগেই চলে গেছেন।"

গাড়ী আসিয়া রাজা বসন্ত রায় রোডে প্রবেশ করিল। বুদ্ধদেব কহিল, "তোমার কি কাজ আছে, বললে না?"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ আছে, তুমি নেমে পড়, আর একাই বাড়ী চলে যাও। আমাকেও একাই যেতে হবে।"

গাড়ী হইতে বুদ্ধদেব নিঃশব্দে নামিয়া পড়িল। গাড়ীখানাও একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে চোখের আড়াল হইয়া গেল।

রাত্রি নয়টার সময় জিতেন্দ্রের গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সামনে থামিল। জিতেন্দ্র একটু চিন্তিত মনে গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

বুদ্ধদেব জিতেন্দ্রের এইরূপ চিন্তিত ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি, জিতুদা?"

জিতেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিল, "প্রশ্ন করো না।"

বুদ্ধদেব বুঝিল যে, জিতেন্দ্র কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সে আর কোন কথা না বলিয়া রমেশকে খাবারের হুকুম দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আর একটিও কথা না বলিয়া জিতেন্দ্র সেই রাত নীরবেই কাটাইয়া দিল।

পাঁচ

ভোরবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়াই জিতেন্দ্র বুদ্ধদেবকে কহিল, "বুঝলে বুদ্ধু, আমাদের শাস্ত্রে বলে,—

চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্।

আমারও ঠিক সেই দশাই হয়েছে। এমন চিন্তার ভেতর পড়ে গেছি যে ওঠ্‌বার সিঁড়ি পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না!"

বুদ্ধদেব ইহার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তবু কহিল, "এরকম চিন্তা তো তোমার নতুন নয়, জিতুদা!"

জিতেন্দ্র কহিল, "তা বটে; তবে ভাবছি যে আমার চিন্তার ভেতর যদি কিছু সত্য খুঁজে পাই, তা'হলেই মঙ্গল। আচ্ছা বুদ্ধু, বলত আততায়ী ক'জন?"

বুদ্ধদেব কহিল, "তা কি করে বলবো?"

জিতেন্দ্র কহিল, "আমার সাথে তো আছ সেই ছোটবেলা থেকে; অথচ এই সামান্য কথাটার উত্তরও আজ দিতে পারলে না? আচ্ছা, খুন হয়েছে ক'জন লোক?"

বুদ্ধদেব কহিল, "তিনজন।"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, তিনজন খুন হয়েছে, তিন জায়গায়—এবং একজন আর-একজন থেকে অনেক দূরে, কি বল? তাছাড়া আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার এই যে, তিনজন ঠিক একই সময়ে খুন হয়েছে। অতএব এ থেকে এই স্থির করা যেতে পারে যে, একজন কি দু'জন লোক এই কাজ

করেনি, করেছে তিনজন। সুতরাং আমি বলবো যে আততায়ী তিনজন।"

বুদ্ধদেব কহিল, "তাইতো হওয়া উচিত।"

জিতেন্দ্র কহিল, "হওয়া উচিত নয়, হয়েছেও তাই। যাক্ এখন কথা হচ্ছে এই যে, আততায়ী যদি তিনজন হয়, তবে স্বভাবতঃই আমাদের এই ধারণা হয় যে, ওদের একটা দল আছে; এবং যদি দল থেকে থাকে তো দলের যে একজন কর্ত্তা আছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। হয় এই তিনজন আততায়ীর মধ্যে কর্ত্তা নিজেও আছে, নয়তো কর্ত্তা নিজে আড়ালে থেকে এদের দিয়ে কাজ করিয়েছে। মোট কথা, আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ হচ্ছে এই কর্ত্তাটি বা চালকটির সন্ধান করা। আমার মনে হচ্ছে এই তিনজন আততায়ীর মধ্যে চালক'ও আছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র।"

বুদ্ধদেব কহিল, "আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে এদের তিনজনের ভেতর চালক বা নেতাটিও আছে। কারণ তোমার অনুমান কখনো মিথ্যে হয় না! আচ্ছা একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। সেদিন ভাল রকম পরীক্ষা ও অনুসন্ধান না করেই যে তুমি প্রফেসারের বাড়ী থেকে চলে এলে, সেখানে কি তুমি কোন রকম সূত্র পেয়েছ?"

জিতেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা'হলে কি তুমি মনে করছ যে আমি অন্ধকারে হাত্‌ড়ে মরছি? এটাতো জান যে আমি কখনো পণ্ডশ্রম করতে রাজী নই!

আমি প্রফেসারের বাড়ীতে সেদিন রাত্রেই একটা ভাল সূত্র পেয়েছি, কিন্তু এখনো সূত্র-অনুযায়ী ভাল রকম সন্ধান করে উঠতে পারিনি। তবে খুব শীগগিরই যে পারব, সে আশা মনে-মনে পোষণ করছি।"

বুদ্ধদেব কহিল, "তোমার সূত্রটা কি এখন প্রকাশযোগ্য ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "এটা একটা অতি সাধারণ সূত্র এবং প্রকাশযোগ্যও," এই কহিয়া সে তাঁহার পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র কাগজের মোড়ক বাহির করিল। তারপর সেই মোড়কখানার ভাঁজ খুলিয়া বাহির করিল এক টুক্‌রা ছোট্ট, নীল রংএর, ভাঙ্গা এবং পাতলা পাথর।

বুদ্ধদেব কহিল, "ওটা কি ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "প্রফেসারের বিছানার চাদরের ওপর এটা পড়ে ছিল। দেখে মনে হচ্ছে, এটা একটা মীনা-করা আংটির একখণ্ড ভাঙ্গা মীনা। বোধ হয় আংটির এই অংশটুকু আততায়ীর হাত থেকে ভেঙ্গে বিছানায় পড়ে গিয়েছিল। আততায়ী যদি পরে সাবধান হয়ে আঙ্গুল থেকে আংটিটা না খুলে ফেলে থাকে, তা'হলে তার ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে। ভাঙ্গা মীনাটুকু দেখে মনে হচ্ছে, এটি খুবই দামী। বাজে লোকের হাতে এরকম আংটি না থাকাই সম্ভব। সেই থেকেই অনুমান করছি যে হয়তো এখানেই দলের নেতা এসে থাক্‌বে।

আততায়ী যদি খুব সাবধানী হয়ে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই আংটিটা হাত থেকে খুলে ফেলে বাক্সে রেখে দেবে। বাক্সে রেখে দিলে আমার অবশ্য এ জিনিষটা পাওয়াই শুধু সার হবে। কিন্তু যদি সে এতটা সতর্ক না হয়ে আংটিটা দোকানে সারাতে দেয়, তা'হলে হয়তো আমার অনেকটা সুবিধে হয়ে যাবে।

আততায়ী যদি আংটিটা সারাতে দিয়ে থাকে, তবে ছোটখাট বাজে দোকানে না দিয়ে তার পক্ষে কোন একটা বড় দোকানে দেওয়াই সম্ভব! আমি ফোন করে কাল

কতকগুলো বড়-বড় দোকানে খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাইনি। তবে সে সব দোকানে বলে রেখেছি যে, যদি এরকম কোন আংটি তাদের দোকানে মেরামতের জন্য আসে, তা'হলে আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ জানানো হয়। দু'দিন আগে হোক্ বা পরে হোক,—আংটিটা যে মেরামতের জন্য দেওয়া হবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যদি আংটিটা মেরামতের জন্য দোকানে দেওয়া হয়, তাহলে এই ভাঙ্গা মীনা-দ্বারাই খুনের একটা কিনারা হতে পারে।"

বুদ্ধদেব কহিল, "এটা যে আততায়ীর হাতের আংটির মীনা, সে বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ ?"

জিতেন্দ্র জোর দিয়া কহিল, "আলবৎ, নিঃসন্দেহ !"

"এমনও তো হতে পারে যে এটা উক্ত প্রফেসারেরই হাতের আংটির মীনা।"

"উঁহু, তা কখনো হতে পারে না এইজন্য যে, আমি মীনা-খানা হাতে নিয়েই প্রফেসারের হাতের প্রতিটি আঙ্গুল লক্ষ্য করেছি। তাঁর হাতে কোন রকম আংটি ছিল না।"

একটু থামিয়া জিতেন্দ্র পুনশ্চ কহিল, "তোমায় আমি বলে দিচ্ছি বুদ্ধ, আজ থেকে সাতদিনের ভেতরেই আমি আততায়ীকে ধরবো তবে ছাড়বো !"

বুদ্ধদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এরকম জটিল কেসে তুমি এই সামান্য একটা সূত্র পেয়েই এত-বড় প্রতিজ্ঞা করে বসলে ?"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "প্রতিজ্ঞা করতে হলে মনের বল আর সাহস দু'টোই দরকার। এ দু'টো আমার আছে বলেই তো আমি প্রতিজ্ঞা করতে সাহসী হলুম ! মনেও ভেবো না বুদ্ধ যে আমি শুধু এই একটি সূত্রের ওপরেই সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভর করে আছি !"

বুদ্ধদেব যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাক্, বাঁচা গেল !"

রমেশ টেবিলের উপর সেইদিনের পত্রিকাখানা আনিয়া রাখিয়া গেল !

বুদ্ধদেব পত্রিকাখানার প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইয়া ঔৎসুক্য-সহকারে একস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলিয়া কহিল, "একটা ভাল খবর আছে, জিতুদা !"

জিতেন্দ্র কহিল, "কোন পুরস্কার-ঘোষণা তো ?"

বুদ্ধদেব অবাক্ হইয়া কহিল, "আশ্চর্য্য ! তুমি বুঝলে কি করে ?"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "বোঝাটা এমন কিছু শক্ত নয়। বড়-বড় খুনের পর এমন দু'চারটে পুরস্কার-ঘোষণা হয়েই থাকে। আমিতো এসব ব্যাপারের সাথে আজ নতুন জড়িত হচ্ছি না, কি বল ? সে যাক্. পুরস্কারটা কি ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "টাকা !"

"সংখ্যা কত ?"

"দশহাজার !"

"দিচ্ছে কে ?"

"বড় বাজারের সেই বিখ্যাত মাড়োয়ারী মহাজন, দানচান্দ-লালচান্দ ব্রাদার্স।"

"মহাজন তা'হলে দুজন অর্থাৎ পার্টনারশিপ ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "তাইতো মনে হচ্ছে।"

জিতেন্দ্র কহিল, "কি লিখেছে ?"

বুদ্ধদেব পত্রিকার দিকে তাকাইয়া কহিতে লাগিল, "এই যে শেষের দিকটাতে লিখেছে...'তিন তিনটি এমন মারাত্মক খুন সমস্ত কলিকাতাবাসীদের পক্ষে নিতান্ত ত্রাসের কথা সন্দেহ

নাই। যে ব্যক্তি এইরূপ দুঃসাহসিকতা-পূর্ণ খুনের দুর্দ্দান্ত আসামীকে ধরিয়া কলিকাতার বুক হইতে এই দারুণ ত্রাসের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে নিম্ন-স্বাক্ষরিত মহাজনদ্বয়ের গদী হইতে উপরোক্ত দশহাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে…।' ইত্যাদি"—কহিয়া বুদ্ধদেব চুপ করিল।

জিতেন্দ্র একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "টাকাটা কোন্ ব্যাঙ্কে জমা দেবে সেটা মনে-মনে ঠিক করে রেখো। বুঝলে বুদ্ধদেব?"

বুদ্ধদেব বুঝিল যে, জিতেন্দ্র এই টাকাটাকে কিছুতেই হাতছাড়া হইতে দিবে না!

ছয়

পৃথিবীতে ভগবানের সৃষ্ট মানবজাতির ভিতর যে কত রকম অভিনব চরিত্র দেখা যায়, তাহা যদি সকলেরই বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে সকলেই ভগবানের অত্যাশ্চর্য্য মহিমায় অতিমাত্রায় মুগ্ধ হইয়া যাইত! কিন্তু দুঃখ এই যে, সকলের তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তিই নাই। যাঁহারা মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাও আশ্চর্য্য হইবেন এমন একটি লোকের চরিত্র দেখিয়া, যে লোকটিকে এক কথায় আমাদের জিতেন্দ্রনাথের গুপ্তচর বলিয়া অভিহিত করা যায়।

লোকটি কোন্ দেশীয় বুঝিবার জো নাই। কোন্‌টা তাহার ছদ্মবেশ এবং কোন্‌টা তাহার আসল পরিচয়, তাহা ধরিতে পারে জিতেন্দ্র ব্যতীত কলিকাতায় আজও এমন লোকের আবির্ভাব হয় নাই! লোকটির পূর্ব্ব-ইতিহাস ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন অর্থাৎ তাহা আজও কেহ জানিতে পারে নাই। লোকটা কথা বলে সুস্পষ্টভাবে কিন্তু কোন-কোন সময় তাহাকে বোবা বলিলেও ভুল হইবে না! অর্থাৎ, এই লোকটিকে যে লক্ষ্য করিয়াছে সে হয়তো দেখিতে পাইয়াছে যে, এই লোকটি পনেরো দিন সমানে কথা কহিয়াছে, আবার হয়তো পনেরো দিন একদম্ কথা কহে নাই।

লোকটা কতগুলি ভাষা জানে, তাহা বলা কঠিন। তবে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার মধ্যে অনেকগুলিই সে জানে। লোকটা সমাজে বিচরণ করে বটে কিন্তু দরকার পড়িলে বছরের পর বছর সমাজের বাহিরে কোথায় যে ডুব মারিয়া থাকে,

তাহার কোন সন্ধানও পাওয়া যায় না! লোকটাকে যখন পুলিশে ধরিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে, তখন সে খোলস বদ্‌লাইয়া পুলিশেরই সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়! লোকটাকে গানের আসরে গান গাহিতে ও বাদ্য বাজাইতে দেখা যায়। খেলার মাঠে সে খেলিয়া বেড়ায়। সভাতে সে বক্তৃতা করে। রাজনৈতিক আলোচনায় তাহাকে যোগ দিতে দেখা যায়। সহরতলীতে সে আড্ডা দেয়। সে গাঁজা খায়, মদ খায়, মাতলামি করে। মাতলামি সে ইচ্ছা করিয়াই করে; কারণ, মদে তাহাকে মাতাল করিতে পারে না। মদ খাইয়া সে ভাল মানুষও সাজিতে পারে, ভদ্রলোকের সাথে মিশিতে এবং কথা কহিতেও পারে।

লোকটা কখনো মোটর-ড্রাইভার, কখনো গাড়ীর গাড়োয়ান, কখনো অফিসের কেরাণী, কখনো স্কুলের মাষ্টার, কখনো বাড়ীর চাকর, কখনো রাস্তার ফেরিওয়ালা, কখনো পথের পাগল, কখনো যুবক, কখনো বৃদ্ধ! লোকটা পুলিশ-কর্ম্মচারী জিতেন্দ্রের কাজ করে বটে কিন্তু কখনো-কখনো পুলিশও তাহাকে ধরিতে চায়! কথাটায় রহস্য আছে, যিনি বুঝিবেন, ভালই,—যিনি না বুঝিবেন তাহাকে না বুঝিয়াই থাকিতে হইবে অর্থাৎ বোঝান যাইবে না!

লোকটার ইতিহাস শুধু তখন হইতেই জানা যায় যখন জিতেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নিজের 'প্রাইভেট' কার্য্যে বহাল করে।

এক সময় একটা ডাকাতের সর্দ্দার, দলবল লইয়া পুলিশকে বিব্রত করিতেছিল। জিতেন্দ্রের হাতে একবার আসিল এই ডাকাত-দলের এক ডাকাতির তদন্তের ভার। সে ডাকাতকে যখন খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন ডাকাতই তাহার পেছনে ঘোরে!

দুইবার ডাকাতকে ধরিতে গিয়া সে ভীষণ বিপদে পড়ে; কিন্তু ডাকাতই তখন ভাল মানুষ সাজিয়া আসিয়া তাহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করে! ভাল মানুষ সাজিয়া ডাকাত তাহার সহিত আলাপ করিয়াও যায় কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে ডাকাতের চিঠি আসিয়া তাহা তাহাকে জানাইয়া দেয়! জিতেন্দ্র ডাকাতকে ধরিতে যায় কিন্তু ডাকাতই তাহাকে উল্টা ধরিয়া ছাড়িয়া দেয়! এইরূপে গোয়েন্দা-ডাকাতে যে খেলা চলে, তাহার সমাপ্তিতে হয় জিতেন্দ্রের জয়!—ডাকাত ধরা পড়ে।

জিতেন্দ্র ডাকাতের অসীম সাহস ও ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার উপর সন্তুষ্ট হয়। জিতেন্দ্রের এইরূপ সন্তোষ ডাকাতের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইয়াই দাঁড়াইল। মামলা যখন চলিতে লাগিল তখন সকলকে বিস্মিত করিয়া জিতেন্দ্র ডাকাতের পক্ষে যোগদান করে এবং তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের এক বিশিষ্ট সাক্ষী হইয়া দাঁড়ায়। ফলতঃ ডাকাত মুক্তিলাভ করিয়া জিতেন্দ্রের একান্ত অনুগত হইয়া পড়ে। জিতেন্দ্র তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিজের গুপ্তচর করিয়া লয়।

উহাদের প্রতিজ্ঞা মস্ত-বড় জিনিষ। যে একবার প্রতিজ্ঞা করে, সে প্রাণ থাকিতে তাহা আর ভাঙ্গে না! সুতরাং জিতেন্দ্রেরও হইল প্রচুর উপকার। এমন অত্যাশ্চর্য্য ডাকাতের সাহায্য পাওয়া যে-সে লোকের কাজ নহে। জিতেন্দ্রও ডাকাতকে ভালবাসিল; কহিল, "তুমি অন্যের অপকার করো না।" ডাকাত তাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিল। তারপর যাহা হইল, বলা হইয়াছে।

লোকটার হাসিবার ও কাঁদিবার রকমও বহু। তাহার প্রকৃতি স্বভাবতঃ গম্ভীর। সে হাসে ও কাঁদে জোর করিয়া! মুদ্রাদোষ সত্যই তাহার আছে কিনা বলা যায় না, তবে মাঝে-

মাঝে তাহাকে সেই দোষে দোষী হইতে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, একবারের সহিত আর-একবারের মিল নাই!

লোকটার আকৃতি দীর্ঘ। শরীরের গঠনে মনে হয় যেন কারিগরের ওস্তাদি আছে! সুদৃঢ় হাড়ের সুদৃঢ় কাঠামো। তদুপরি প্রচুর মাংস। হস্ত ও পদদ্বয় পেশীবহুল; বক্ষ অস্বাভাবিক বিস্তৃত। ঘাড় এত মোটা যে এক কোপে গলা নামানো কাহারও সাধ্য নহে! রং কখনো ফর্সা কখনো কালো; কোন্‌টা তাহার আসল রং বোঝা কঠিন! চক্ষু আয়ত ও ভাসা-ভাসা; কিন্তু উহাকে ক্ষুদ্র ও কোটরগত হইতেও দেখা যায়! মস্তকে চুল আছে কিন্তু টাকের অস্তিত্বও মাঝে-মাঝে গোচর হয়! কর্ণ কখনো লোমশ, কখনো লোমহীন! নাসিকা বেশীর ভাগ সময়েই দীর্ঘ, কখনো খর্ব্ব হইতেও দেখা গিয়াছে। মুখে দুই পাটি দাঁত কখনো ঝক্‌ঝক্ করিয়া ওঠে, আবার কখনো ফোক্‌লা দাঁতের ভিতর দিয়া লাল জিহ্বাটি নড়্‌বড়্ করে! লোকটার আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভাল ও মন্দের অপূর্ব্ব সমাবেশ! কোন্‌টা যে আসল এবং কোন্‌টা যে নকল, বুঝিবার জো নাই। এক কথায় সে একটা ওস্তাদ বহুরূপী!

লোকটা গুণ্ডা সাজিয়া গুণ্ডার দলে ঘোরে; বৃদ্ধ সাজিয়া বৃদ্ধদের মাঝে বসে; যুবক সাজিয়া যুবকদের ভিতর আড্ডা দেয়। ভদ্রলোক সাজিয়া ভদ্র-সমাজে ঘুরিয়া বেড়ায়।

তাহার গলার স্বরও বহু প্রকার। কখনো গম্ভীর, কখনো চঞ্চল; কখনো মোটা, কখনো মিহি; কখনো কর্কশ, কখনো মধুর; কখনো সুরো, কখনো বেসুরো—ইত্যাদি।

এ হেন লোকটির প্রকৃতি অনেকটা যাযাবর-জাতীয়। তাহার বাসস্থানের কোন ঠিকানা নাই। আজ এখানে, কাল সেখানে। প্রতি সপ্তাহে শুধু সে একবার করিয়া জিতেন্দ্রের

কাছে হাজিরা দেয়। জিতেন্দ্র সে দিনটাতে এবং সে সময়টাতে বাড়ীতেই থাকে। জিতেন্দ্রের নিকট আসিয়া সে তাহার কাজ বুঝিয়া দেয় ও বুঝিয়া লয়।

লোকটাকে ঠিক 'স্পাই' বলিলে ভুল করা হইবে। 'স্পাই' নিরীহ লোকেরও ক্ষতি করে কিন্তু সে তাহা করে না। 'স্পাই'-এর কাজ সীমাবদ্ধ এবং একটি। গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাহাকে কিছু করিতে বা বলিতে দেখিলেই 'স্পাই' তাহার পিছনে লাগিবে। কিন্তু এ লোকটার কাজ তাহা নহে। ইহার কাজ প্রকৃত দোষীকে খুঁজিয়া বেড়ানো। এ হেন দোষী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও দোষ করিতে পারে, জনসাধারণের বিরুদ্ধেও দোষ করিতে পারে; এমন কি, যে কোন একটি লোকের বিরুদ্ধেও দোষ করিতে পারে। সে জিতেন্দ্রের নির্দ্দেশ মত কাজ করে, নির্দ্দেশ ছাড়াইয়া গোঁয়ার্ত্তুমির পরিচয় দেয় না।

মোট কথা, এ লোকটি অতি মোলায়েম ও সাঙ্ঘাতিক! কলিকাতার বুকে আজিও এ লোকটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহই ইহাকে চিনিতে বা ধরিতে পারে না। অতএব দোষী মাত্রেরই সাবধান হইয়া থাকা উচিত, কেননা সাবধানের মার নাই!

লোকটির নামের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ কথা নহে। বহুরূপীর বহু নাম! কিন্তু তবুও তাহার একটা নাম আছে; সে নাম ধরিয়া জিতেন্দ্র তাহাকে ডাকে। তাহার এ নামে আড়ম্বর নাই, কিন্তু কেমন যেন একটু ভয়ের ভাব বিজড়িত!

এ নামটা তিনজন লোকে মাত্র জানে। তাহাদের দুইজন—জিতেন্দ্র ও বুদ্ধদেব। তৃতীয় জন, নামের মালিক নিজে। এ নামটা তাহার কি করিয়া, কোথা হইতে, কবে আসিল, তাহার ইতিহাস জানা যায় না। যাহা জানা যায় তাহা এই যে,

জিতেন্দ্র তাহাকে এই নামেই ডাকে। এ নামের ভিতর রহস্য আছে; কিন্তু সে রহস্য উদ্ধার করা যায় না। উদ্ধার করা যায় না বলিয়াই সে রহস্য আরো গভীরতর হয়।

লোকটির নাম 'কাক।' সকলের বাড়ীর ছাদে, গাছের মাথায়, উঠানের কিনারে, আশে পাশে কাক উড়িয়া বেড়ায়। কেহ কাকের দিকে তাকায় না। সকলেই জানে যে, কাক একটি নিরীহ প্রাণী। কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে গেলে কাকের ন্যায় প্রাণী নাই, কাকের ন্যায় নাম নাই। সুতরাং কাক হইতে সাবধান!

সাত

বুধবার, রাত্রি সাড়ে বারোটা। জিতেন্দ্র একা ড্রইংরুমে বসিয়া আছে, এমন সময় দরজায় সামান্য একটু শব্দ হইল। জিতেন্দ্র সেদিকে তাকাইয়া দেখিল, একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।

লোকটির মুখখানি কালো রংএর দাড়ি ও গোঁফে একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। পরণে গেরুয়া রংএর আলখাল্লা। পা খালি। হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে একটি উজ্জ্বল রক্ত-চন্দনের ফোঁটা বিজলী বাতির আলোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

লোকটি দরজার কাছে একটু দাঁড়াইল, তারপর দুই হাত দিয়া শূন্যে একটা নক্সার ন্যায় দাগ কাটিল।

অমনি জিতেন্দ্র কহিল, "কে, কাক? এসো।"

. কাক কাছে আসিয়া জিতেন্দ্রের পাশে একখানি কৌচের উপর বসিল। জিতেন্দ্র উঠিয়া আসিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

জিতেন্দ্র কাকের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কোত্থেকে এলে?"

কাক গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "কস্‌বা।"

জিতেন্দ্র কহিল, "একটা নতুন 'কেস্' পেয়েছি।"

কাক কহিল, "সরল না জটিল?"

জিতেন্দ্র কহিল, "জটিল।"

কাক কহিল, "সূত্র—পথে না বিপথে ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "পথে।"

"সাহায্য চাই, না চাইনা ?"

"চাই।"

"বলুন।"

জিতেন্দ্র কহিতে লাগিল, "আগামী কাল রাত বারোটার সময় কাজ শেষ করে হয় এখানে আসবে, নয় আমাকে ফোন করে জানাবে।"

কাক মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল।

জিতেন্দ্র কহিতে লাগিল, "কাল সকাল ছ'টা থেকে রাত দশটা অবধি বড়বাজার 'লালচাঁন্দ-দানচাঁন্দ ব্রাদার্স' দোকানটির সম্মুখ দিয়ে যে সমস্ত প্রাইভেট মোটর-গাড়ী যাতায়াত করবে, তাদের 'নম্বর'গুলো টুকবে; আর রাত দশটার পর হিসেব করে যে নম্বরওয়ালা গাড়ীটা বেশী যাতায়াত করেছে, সে নম্বরটা আমায় ফোনে অথবা নিজে এসে জানাবে।"

কাক কহিল, "কঠিন কিছু ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "সারাদিন তো ওখানেই পাহারায় থাকবে, আর কিছুতো সম্ভব হবে না !"

কাক শব্দ করিল না, কৌচ হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে দরজার দিকে আগাইয়া গেল। তারপর দরজা খুলিয়া ঠিক যেমনভাবে অন্ধকারের ভিতর হইতে উদিত হইয়াছিল তেমনিভাবে উহার ভিতর বিলীন হইয়া গেল।

কাকের দর্শন মিলিল। কিন্তু এ তাহার বহুরূপের একটি রূপ। এ রূপে অস্থিরতা নাই, আছে অস্বাভাবিক স্থিরতা। এই রূপ বাচালতার বিপরীত, বাক্‌চোরা ও সংযমী। কাককে

বুঝিবার পক্ষে তাহার এ রূপ একেবারেই যথেষ্ট নহে। তাহাকে বুঝিতে হইবে, অতএব তাহার অন্য রূপের প্রত্যাশায় থাকিতে হইতেছে!

কাকের বহির্গমনের পর-মুহূর্ত্তেই জিতেন্দ্র কৌচ ত্যাগ করিল, এবং আলো নিভাইয়া র‍্যাগ্‌খানা-গায়ে জড়াইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার গাড়ী যখন বড়বাজারস্থ মাড়োয়ারীর দোকানের সম্মুখে আসিয়া থামিল, রাত্রি তখন দেড়টা বাজিয়া গিয়াছে।

জিতেন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া উক্ত দোকানের নিকটবর্ত্তী একটা লাইট-পোস্টের সম্মুখে দাঁড়াইল, তারপর পকেট হইতে একখানি কাগজ ও গঁদের শিশি বাহির করিয়া উক্ত কাগজ-খানা লাইট্‌-পোস্টের গায়ে ভাল করিয়া আঁটিয়া দিল। এইভাবে কাজ শেষ করিয়া, সে আবার গাড়ী চালাইয়া বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিল। রাস্তায় বিশেষ কোন লোক-চলাচল ছিল না, সুতরাং জিতেন্দ্রকে কেহই লক্ষ্য করিল না।

ভোরের আলোয় দেখা গেল, একজন দুইজন করিয়া উক্ত 'লাইট-পোস্টের' কাছে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর জনতার সৃষ্টি হইতেছে। সকলেই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উক্ত লেখাটি পড়িয়া আবার নিজ-নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতেছে।

লেখা কাগজটি এমন বিশেষ কিছুই নহে। উহাতে জিতেন্দ্র লিখিয়াছে, "মেধাবী লোকদিগকে জানান যাইতেছে যে, কলিকাতার বক্ষে এমন একদল নর-দানবের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা মেধাবী লোকের মস্তক কাটিয়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা-বোধ করে না। পাশের দোকানে যে এই রকম একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা জনসাধারণের অবিদিত নহে। এই রকম আরও দুইটি হত্যাকাণ্ড এই

কলিকাতার বক্ষে একই রাত্রে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। একটি ভদ্রবেশী ধড়িবাজ এই নর-দানবদিগের নেতা হইয়া এই অমানুষিক কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার উদ্দেশ্য এখনও বোধগম্যের বাহিরে; সুতরাং মেধাবী জনসাধারণকে সাবধান করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন অতঃপর যতদূর সম্ভব সাবধানতার আশ্রয় অবলম্বন করেন! ভদ্রবেশী পাষণ্ডটি ভদ্র-সমাজেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাবধান!”

লেখাটির নীচে কাহারও নাম বা ঠিকানা নাই; সুতরাং কে লিখিয়াছে, তাহা জনসাধারণের বোধগম্যের বাহিরে; কিন্তু কিজন্য লিখিয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

লাইট-পোষ্টের কাছাকাছি কিছুদূরে ডাষ্টবিনের একপাশে একটা অর্দ্ধ-উলঙ্গ পাগল শুধু একখানা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছে এবং বিকৃতস্বরে গাহিতেছে,—

“এই গরমে খেতে ভাল
মরুল্লা মাছের পেটী ভাজা;
পুঁটি মাছের মুড়ঘণ্ট,
আচ্ছা একটান শিবের গাঁজা!
থুঃ থুঃ থুঃ!”

এই বলিয়াই সে সম্মুখের দিকে মাথা ঘুরাইয়া থুথু ছিটাইতেছে! রাস্তার অপর পার্শ্বে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া অনেক লোক তামাসা দেখিতেছে বটে কিন্তু কেহই সম্মুখে বা পাশে আসিতে সাহসী হইতেছে না, পাছে পাগলের থুথু গায়ে লাগিয়া যায়! পাগল গান গাহিতেছে আর হাতে একখানা পেন্সিল লইয়া একটা ময়লা কাগজের উপর আঁকিচুকি করিতেছে।

পাগলের গান শুনিয়া দর্শক ও শ্রোতারা হাসিতেছিল কিন্তু

সেই ফাঁকে পাগল তাহার আসল কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল। সেই রাস্তায় যতগুলি প্রাইভেট মোটর-গাড়ী যাইতেছিল, সে তাহাদের নম্বরগুলি নিখুঁৎভাবে একখানি ময়লা কাগজে লিখিয়া লইতেছিল।

পাগলের থুথু-ছিটানোর ভিতর উদ্দেশ্য আছে। পাগল দেখিলে স্বভাবতঃই তাহার চারিদিকে লোকের ভীড় জমিয়া যায়। পাগলও তাহা জানিত; জানিত বলিয়াই তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সে তাহা হইলে লোকের ভীড়ের ভিতর দিয়া ছুটন্ত গাড়ীগুলির নম্বর দেখিয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে না। তাই সে এই অভিনব পন্থার আশ্রয় লইয়াছিল। থুথু ছিটাইয়া, অপরের কোন রকম সন্দেহের কারণ না হইয়া, সে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল; এমন কি, কাছেও কাহাকে ভিড়িতে দিতেছিল না!

অদ্যকার পাগলের সহিত গত রাত্রির গেরুয়াধারীর কোন রকম সামঞ্জস্য ছিল না। অদ্যকার পাগলের বর্ণনা এক অতি হাস্যকর ব্যাপার! আজ সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার জিনিষ তাহার চক্ষু দুইটি।

পাগলের একটি চক্ষু ভাসা আয়ত এবং নিষ্প্রভ, কিন্তু অপরটি কোটরগত, ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণ অর্থাৎ সন্ধানী! তাহার এ চক্ষুটার সহিত রাত্রিকালের বিড়ালের চক্ষুর তুলনা করা চলে। ভাসা চক্ষুটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কিন্তু কোটরগত চক্ষুটি কৃত্রিম পিঁচুটিতে পরিপূর্ণ। গোঁফ ও দাড়ি—কতক আছে, কতক নাই। লম্বা চুলে জট ধরিয়াছে। সেখানে তৈলের আভাষ মাত্র নাই। কানে একটি আধপোড়া বিড়ি। গায়ে একখানা জীর্ণ ও ময়লা কাঁথা! পাগলের আশেপাশে দুই-

চারিটা ভাঙ্গা ও কালিমাখা হাঁড়ি ইতস্ততঃ ছড়ানো। একটা মাটির পাত্রে সামান্য কিছু পান্তাভাত ও দুই-তিনটা কাঁচা লঙ্কা। কর্পোরেশনের রাস্তার কতকাংশ পাগলের ছিটানো থুথুতে একেবারে ভিজিয়া যাইতেছে।

পাগল একবার উঠিল। তারপর সম্মুখে জনতার দিকে তাকাইল। একটু পরে উপুড় হইয়া একটা ঢিল তুলিল। সম্মুখের দিকে আবার তাকাইয়া দেখিল, কয়েকটি ছোট ছেলে ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইতেছে।

পাগলের হাসি পাইল; অন্ততঃপক্ষে বাহির হইতে তাহাই মনে হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার হাসি পায় নাই; কারণ, তাহার প্রকৃতি একটু গম্ভীর। তবু তাহাকে হাসির অভিনয় করিতে হইল, অর্থাৎ সে জোর করিয়া হাসিল,—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!"

পাগল একটু থামিল, আবার মিহি সুরে হাসিল,—"হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ!" একটু থামিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া কর্কশস্বরে আবার হাসিল,—"হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!" হাসিতে হাসিতে এবার সে গড়াইয়া পড়িল। গড়াইয়া পড়িয়াও হাসিতে লাগিল। এবার হাসিল খোনা গলায়, তাই শব্দ হইল,—"খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ খ্যাঃ!"

আট

পাগল হাসিতেছিল। তাহার হাসি দেখিয়া ভাল মানুষও হাসিতে লাগিল। ছেলেরা জোরে হাসিল, প্রবীণেরা মুচ্‌কি হাসিল, মোট কথা হাসিল সবাই। হঠাৎ পাগল হাসি থামাইল, একেবারে গম্ভীর হইল! এ-বিদ্যায় সে পারদর্শী ছিল।

পাগলের গাম্ভীর্য্য ভাল লোকের আরো বেশী হাসির কারণ হইল, তাহারা আরো বেশী হাসিতে লাগিল! সকলেই হাসিল বটে কিন্তু কেহই আধ মিনিট কি এক মিনিটের বেশী সে স্থানে অপেক্ষা করিল না। কলিকাতার পথে-ঘাটে এরকম কত-শত ঘটনা নিত্য দৃষ্টিগোচর হয়, সেদিকে মন দিতে গেলে হাতের সময়টুকু উবিয়া যায়। ব্যস্ত জনতা তাই সেখানে দাঁড়াইয়াই চলিয়া যায়!

একটি মোটর-গাড়ী পাগলটাকে ছাড়াইয়া কিছুদূরে গিয়া থামিয়া পড়িল। পাগলের কাগজে তাহার নম্বর অঙ্কিত হইয়া গেল। পাগল আড়চোখে দেখিল, মোটর হইতে একটি লোক নামিয়া তাহার দিকেই আসিতেছে।

লোকটি পাগলের কাছে আসিল না, লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে সেই কাগজের লেখাটি পড়িতে লাগিল। পাগল তাহার কাজে মনোনিবেশ করিল। কিছুক্ষণ পর পাগল লক্ষ্য করিল, লোকটি মোটর-গাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছে। পাগলের এক চক্ষু কোটরগত কিন্তু তাহার দৃষ্টি

তীক্ষ্ণ! সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল যে, উক্ত লোকটির মুখমণ্ডলে একটা ভীতির ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

লোকটির আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, গায়ে সার্জ্জের পাঞ্জাবী, কাঁধের উপর শাল, চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চশমা এবং হাতে একজোড়া পশমী দস্তানা। লোকটি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিল। মুহূর্ত্তের ভিতর গাড়ীখানা দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল।

পাগল এবার মুচ্‌কি হাসিল। কেন হাসিল, সেই বলিতে পারে; মোটকথা সে হাসিল! একটির পর একটি করিয়া মোটর-গাড়ী পাগলের সম্মুখবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং পাগলও তাহাদের নম্বরগুলি টুকিতে লাগিল।

আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। এমন সময় একটি মোটর আসিয়া উক্ত লাইট্‌-পোস্টটার কাছে থামিল! পাগল গাড়ীর নম্বর টুকিল। আবার গাড়ীর দিকে তাকাইল, তৎপর নিজের কাগজের দিকে তাকাইল। দেখিল, আগে যে মোটরটি থামিয়াছিল, তাহার নম্বর আর এই মোটরটির নম্বর মিলিয়া গিয়াছে; অর্থাৎ এই গাড়ীখানাই কিছুক্ষণ আগে এখানে একবার আসিয়াছিল!

পাগল ঐ নম্বরের পার্শ্বে দুইটি দাগ কাটিল। অতঃপর সে আবার মুচ্‌কি হাসিল! মাথা নাড়িল—তারপর গান ধরিল,—

"তুই কে তা জানি না বাবা,
আমি কিন্তু নইরে হাবা!
আমি তোর বাবার বাবা;
জিতবে এবার আমার দাবা!
(হায়রে) জিতবে এবার আমার দাবা! থু উঃ!"

পাগল সম্মুখে একবার থুথু ছিটাইল। সেই ফাঁকে কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষুটি দিয়া একবার মোটরের দিকে তাকাইল!

মোটর হইতে যে লোকটি নীচে নামিল, সে তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। লোকটির আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ ঘোর কালো, চোখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট! লোকটা লাইট্-পোস্টটার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় মোটরখানা—প্রথমে ধীরে, তারপর বিদ্যুদ্‌গতিতে পথ অতিক্রম করিল।

পাগল হাসিল, আবার গান ধরিল,—

"মরণ-ফাঁদে পড়লি যখন
যম ব্যাটা আড়ালে হাসে;
সেই ব্যাটাকে মারবো আমি,
বসে আছি তারই আশে!
(হায়রে) বসে আছি তারই আশে! থুঃ!"

পাগল গান গায়, লোকে তা শুনিয়া হাসে। কিন্তু লোকের মনে সন্দেহ হয় না, পাগল তাই বাঁচিয়া যায়!

পাগলকে দেখিয়া অনেকেই ভয় পায়; কারণ, যাহার মাথার ঠিক নাই, সে করিতে পারে না এমন কাজ নাই।

পাগল নানাপ্রকার; নিরীহ, হিংস্র, ধূর্ত্ত, বোকা প্রভৃতি। নিরীহ পাগল হইতে ভয় নাই এইজন্য যে, সে মুখে যা-তা বলিয়া যায় কিন্তু কাহারও ক্ষতি করে না। হিংস্র পাগলও কতকটা গ্রহণীয় এইজন্য যে, তাহার প্রকৃতি হিংস্র বলিয়া সকলেই তাহার নিকট হইতে দূরে থাকে এবং সেজন্য পাগল তাহার হিংস্র ভাব নিজ মনে পোষণ করিয়া জ্বলিয়া মরে। কিন্তু ভয় হইল ধূর্ত্ত পাগলকে লইয়া। ইহাকে বিশ্বাস করা যায় না—ইহার স্বভাবের স্থিরতা নাই। এক-এক সময় এক-এক রকম। সে হিংস্রও হইতে পারে, নিরীহও হইতে পারে।

আজকাল পৃথিবীতে ধূর্ত্ত পাগলের সংখ্যা সবচেয়ে

বেশী। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহাদের ভিতর প্রকৃত পাগল মাত্র দুই-চারিটি, বাকীগুলি পাগল নহে—পাগলের অভিনয় করে মাত্র। তাহারা গুপ্তচর। মানুষ পাগলকে অবহেলা করিয়া তাহার সম্মুখে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করে না; কারণ, মানুষ জানে যে পাগল কিছু বুঝিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গুপ্তচর পাগল সাজিয়া গুপ্ত কথা জানিয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রকৃত পাগলের সংখ্যা খুব বেশী নহে। বেশীর ভাগ পাগলই অপ্রকৃত! আমাদের এই পাগলটিও অপ্রকৃত; এককথায় সে ছদ্মবেশী। তাহাকে ধূর্ত্ত পাগল-শ্রেণীতে ফেলা যায়। এই পাগল হইতে ভয় আছে কিন্তু সে ভয় দোষীর; এ পাগল কখনো নির্দ্দোষীর পিছনে লাগে না,—অন্ততঃ যথাসাধ্য সে তাহা করে না। কিন্তু কোন কোন সময় তাহাকে বাধ্য হইয়া নির্দ্দোষীর পিছনেও ঘুরিতে হয়; কারণ, সে নির্দ্দোষীর দ্বারাও মাঝে-মাঝে দোষীর সন্ধান পাইয়া থাকে। তবে মোটকথা,—সে নির্দ্দোষীর অনিষ্ট করে না।

পাগল দেখিল, লোকটা ঐ লেখাটি পড়িতেছে। পড়া শেষ হইলে লোকটা কাছেই একটা পানের দোকানে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পর এক প্যাকেট ক্যারাভ্যান সিগারেট কিনিল। পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। তারপর বিচিত্র প্রণালীতে ধোঁয়া বাহির করিয়া শূন্যমার্গে অসংখ্য কুণ্ডলীর সৃষ্টি করিতে লাগিল।

পাগল শুধু লক্ষ্য করিল যে, লোকটা সিগারেট টানিতেছে, আর দোকানদারের সহিত হাসিয়া-হাসিয়া গল্প করিতেছে। কথাবার্ত্তা শোনা যায় না বটে, তবে কথাবার্ত্তা যে চলিতেছে, আকার-ইঙ্গিতে তা বোঝা যাইতেছে।

মিনিট পনেরো এই ভাবে কাটিয়া গেল। লাইট্-পোস্টের নীচ হইতে তখন ভীড় কমিয়া গিয়াছে। লোকটি দোকান হইতে বাহির হইয়া লাইট্-পোস্টের কাছে আসিল। পকেট হইতে একটা ছুরি বাহির করিয়া একবার চারিদিকে তাকাইল, কিন্তু কি মনে করিয়া যেন ছুরিখানা আবার পকেটের ভিতর রাখিয়া দিল। আবার সে একবার চারিদিকে তাকাইল। হঠাৎ পাগলের উপর তাহার চোখ পড়িল। সে পাগলের কাছে আগাইয়া আসিল।

পাগল তখন গাহিতেছে,—

"মা কালি তুই জানিস তো সব,
বলে দে আমারে ;
আর কত ছলনা করবি,
মরি যে আঁধারে !
নইলে তোর মুণ্ডমালা,
ছিঁড়বো তবে মিটবে জ্বালা ;
ছিন্ন মাথার রস চুষিব,
ভয় করি না কারে ;
মা কালি তুই জানিস তো সব,
বলে দে আমারে !
তেরে তেরে ধিন্, তেরে তেরে ধিন্,
তা ধিন্, তা ধিন্,—ত্রাক্, ত্রাক্, ত্রাক্ !"

বিকৃত স্বরে পাগল গান গাহিতে লাগিল আর অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। লোকটি পাগলের গান শুনিয়া ও তাহার অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া একটু হাসিল। ঘোর কালো মুখের ভিতর সাদা ছোট-ছোট দাঁত কয়টা ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। পাগলের একপাশে সে উপুড় হইয়া বসিল।

পাগল তাহাকে লক্ষ্য করিল কিন্তু থুথু ছিটাইল না।

এক মিনিট বসিয়া থাকার পর লোকটা প্যাকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া পাগলের দিকে বাড়াইয়া দিল।

পাগল হাসিল, "হেঃ হেঃ হেঃ!" মুখে কহিল, "প্যাকেট দে!"

লোকটি দুই ঠোঁটে সিগারেটটি চাপিয়া ধরিয়া পাশের পকেট হইতে প্যাকেটটি বাহির করিল। তারপর চারিদিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "প্যাকেট দেবো, ঐ কাগজটা ছিঁড়ে ফেল্।" এই বলিয়া আঙ্গুল দিয়া ইসারায় লাইট্-পোষ্টের গায়ে লাগানো কাগজটি দেখাইয়া দিল।

পাগল হাসিল, "হিঃ হিঃ হিঃ!" কহিল, "দে।"

লোকটা প্যাকেটটি তাহার হাতে দিল। পাগল উঠিল। অঙ্গভঙ্গী করিয়া লাইট্-পোষ্টের কাছে গিয়া লম্বা নখের আঁচড়ে কাগজটি ছিঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিল।

দুই-একজন লোক দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। তাহারা পাগলের কীর্ত্তি দেখিয়া হাসিল কিন্তু সকলে ব্যাপারটা বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিল না। যাহারা পারিল, তাহারা পাগলের ভয়ে ঐ স্থান হইতে চট্‌পট্ সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর ঐ মোটর-গাড়ীটি আবার আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল। বেঁটে লোকটি খুব সাবধানে মোটরে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। মোটরটি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

বেঁটে লোকটি পাগলকে দিয়া নিজের কাজটুকু সারিয়া লইল বটে কিন্তু সে ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিল না যে, পাগল প্রকৃত পাগল নহে,—সে আমাদের ছদ্মবেশী কাকু!

নয়

রাত্রি বারোটার সময় জিতেন্দ্রের টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। জিতেন্দ্র রিসিভার তুলিয়া লইয়া কহিল, "হ্যালো, কে ?"

ওধার হইতে উত্তর আসিল, "আমি কাক। মোটরের নম্বরটা টুকে নিন, BLA 3629."

জিতেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নোটবই বাহির করিয়া উক্ত নম্বরটি টুকিয়া লইল ; কহিল, "তারপর ?"

কাক কহিল, "তিনবার হানা দিয়েছে। আর কোন গাড়ী ও-রাস্তায় তিনবার যাতায়াত করেনি। একটা বিশেষ খবর আছে। আমি রাস্তার ধারে পাগল সেজে বসে ছিলুম। আমার পাশেই একটা লাইট্-পোষ্টে আঁটা একটা কাগজে লেখা ছিল......"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, জানি। তারপর ?"

কাক কহিল, "ঐ মোটর থেকে একটি লোক নেমে আমাকে দিয়ে ঐ কাগজটা উঠিয়ে ফেলেছে।"

জিতেন্দ্র কহিল, "কাগজটা যে উঠিয়ে ফেলবে, তাও আমি জানতুম। আচ্ছা তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে ; কিন্তু লোকটার চেহারা কি রকম বললে না তো ?"

কাক কহিল, "বেঁটে মতন ; রং কালো কুচকুচে, চুল পেছনে নেই বললেই চলে কিন্তু সামনে ইয়া লম্বা চুল, উল্টানো ; পরণে খাকি সার্ট ও সাদা পায়জামা।"

জিতেন্দ্র কহিল, "কালকে রাত্রি বারোটার সময় আমার

এখানে একবার আসতে হবে। পরের সপ্তাহে পূরো ছুটি পাবে।"

কাক কহিল, "আসবো।"

জিতেন্দ্র রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

দুপুরে আহারান্তে জিতেন্দ্র সবেমাত্র বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় জিতেন্দ্রের টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

জিতেন্দ্র রিসিভার তুলিয়া জানিতে পারিল যে, খবর আসিতেছে বড় একটি স্বর্ণকারের দোকান হইতে।

জিতেন্দ্র কহিল, "খবর কি?"

উত্তর হইল, "মীনা খসে-পড়া একটি আংটি এখানে সারাবার জন্য দিয়ে গেছে।"

জিতেন্দ্র উৎসুক হইয়া কহিল, "কখন?"

"আজকে এইমাত্র।"

"কে দিয়ে গেল?"

"একটি লোক; নাম বললে, সুশীল মজুমদার।"

"দেখতে কেমন?"

"বেঁটে চেহারা, রং কালো, চোখ দু'টো ছোট, কপাল চওড়া, চুল সামনে বড়, পেছনে একদম নেই বললেই চলে, গায়ে একটা হাফহাতা সার্ট, পরণে কালো চুলপেড়ে ধুতি।"

"ব্যস্, আর দরকার পড়বে না। আমি আসছি, আংটিটা আমাকে দেখতে হবে।"

মিনিট তিনেকের ভিতরেই জিতেন্দ্রের গাড়ী গ্যারেজ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টাদুই পর জিতেন্দ্র বাড়ীতে ফিরিল পদব্রজে। বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিল, "কোন হদিস মিললো?"

জিতেন্দ্র মন-মরা ভাবে কহিল, "হ্যাঁ, মিলেছে। দু'একদিন বাদেই সব জানতে পারবে; এখন আর প্রশ্ন করো না।"

বুদ্ধদেব চুপ করিয়া রহিল। বুঝিতে পারিল যে, জিতেন্দ্রের মন বিশেষ ভাল নহে। কিন্তু তবুও সে জিতেন্দ্রের এইরকম মানসিক ভাবের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। রহস্য উদ্ধারের কোন রকম সূত্র পাইলে জিতেন্দ্রকে সে সাধারণতঃ প্রফুল্ল হইতেই দেখিয়াছে। আজও জিতেন্দ্র বলিয়াছে যে, রহস্য উদ্ধারের হদিস পাওয়া গিয়াছে। তবে তাহার মন ভাল নহে কেন?

বুদ্ধদেব অনেক চিন্তা করিয়াও ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিতে-ভাবিতে চিন্তিত মনে সে জিতেন্দ্রের অনুগমন করিল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিতেন্দ্র কহিল, "একটা বিষয়ে আমাকে ঠকতে হয়েছে, বুদ্ধু! মোটরের লাইসেন্স-বুক প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা অবধি সূক্ষ্মভাবে খুঁজলুম; কিন্তু BLA 3629 নম্বরটা পাওয়া গেল না।"

বুদ্ধদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বল কি? তা'হলে কি কাক ভুল নম্বর দিয়েছে?"

জিতেন্দ্র কহিল, "না, কাক ঠিকই দিয়েছে। কিন্তু মোটরে যে নম্বরটা আঁটা ছিল, সেটি মোটরের আসল নম্বর নয়, ওটা আত্মরক্ষার একটা ভাল অস্ত্র। মোটরের মালিক ঠিক মাপমত একটা কালো রংএর টিনের ওপর এই নম্বরটা লিখে, আসল নম্বরের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন এবং তাতেই তিনি কাককে ঠকিয়েছেন।"

বুদ্ধদেব কহিল, "কিন্তু এটাতো তোমার অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়?"

জিতেন্দ্র কহিল, "অনুমান হলেও এটা সত্যি। এই অনুমান কখনো ভুল নয় এইজন্য যে, ওটা যদি বিদেশের গাড়ী হোত তবে BLA কথাটি থাকতো না। আবার BLA কথাটি থাকা সত্ত্বেও যখন তাকে লাইসেন্স-বুকে পাওয়া গেল না, তখন বুঝতেই হবে যে, ওটা ঝুটা নম্বর। সুতরাং বলছি যে, আমার এ অনুমান অসত্য নয়।" এই বলিয়া জিতেন্দ্র রমেশকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি চা দিবার হুকুম করিল।

বুদ্ধদেব কহিল, "এই তিনটের সময় চা? কোথাও বেরুচ্ছো নাকি?"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, একটু বজবজের দিকে যেতে হচ্ছে— অবশ্য তদন্ত-ব্যাপারে। রাত বারোটার আগেই ফিরবো, কাকের সাথে এখানে বারোটার সময় এনগেজমেণ্ট আছে।"

বুদ্ধদেব কহিল, "গাড়ী কোথায়? তোমাকে যে হেঁটে আসতে দেখলুম!"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আমাকে হেঁটে বাড়ীতে আসতে দেখেই তোমার একথাটা বলা উচিত ছিল। এখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে; যা হোক, বলছি। মোটরটার টায়ার আসবার সময় হঠাৎ ফেটে গেছে। দোকানে বদলাতে দিয়েছি।"

বুদ্ধদেব কহিল, "বল কি? গাড়ী এখনি সারা হবে তো?"

জিতেন্দ্র কহিল, "তার দরকার নেই। অমিয়র গাড়ী চেয়ে নিয়ে যাবো।"

মিনিট পনেরোর ভিতর চা খাইয়া জিতেন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল।

জিতেন্দ্র ফিরিয়া আসিল রাত্রি সোয়া এগারোটায়। একটা কাগজের ক্ষুদ্র প্যাকেট পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের

উপর রাখিয়া জিতেন্দ্র আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল ও অর্দ্ধ-নিমীলিত লোচনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিবার পর-মুহূর্ত্তেই সম্মুখবর্ত্তী দরজায় কচ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল।

জিতেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, দরজা খুলিয়া একটি পুলিশ ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। পুলিশের পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা অনাবশ্যক। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুই হাত তুলিয়া শূন্যমার্গে নক্সার ন্যায় একটা দাগ কাটিল।

জিতেন্দ্র কহিল, "কে, কাক? এসো।"

কাক আগাইয়া আসিয়া জিতেন্দ্রের পাশে কৌচে উপবেশন করিল।

আজ কাক পুলিশের বেশে আসিয়াছে। এতো রাতে পুলিশের বেশে রাস্তায় হাঁটাই সব চাইতে নিরাপদ; কারণ, তাহা হইলে সত্যিকারের পুলিশের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়!

জিতেন্দ্র উঠিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল, তারপর আবার স্বস্থানে উপবেশন করিয়া কহিল, "কোত্থেকে এলে?"

কাক উত্তর দিল, "লিলুয়া।"

জিতেন্দ্র কহিল, "প্রথম কথাই হচ্ছে তোমার দেওয়া গাড়ীর নম্বরে কোন কাজ হোল না।"

কাক উৎসুক হইয়া কহিল, "কেন?"

জিতেন্দ্র কহিল, "ওটা ঝুটা নম্বর। ঐ গাড়ীর মালিক তোমায় ঠকিয়েছে। তাই বলে মনে করো না যে, কাজ আমি করতে পারিনি! কাজ আমার হয়ে গেছে, অবশ্য একটু

বেগ পেতে হয়েছে। যাক সে কথা, এখন আসল কথায় আসা যাক।

১০নং ল্যান্সডাউন রোডে সলিল চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক বাস করেন। তিনি এম্-কম্ পড়ছেন। বর্ত্তমানে আততায়ী কর্ত্তৃক তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা হয়েছে। আজ থেকে আগামী মঙ্গলবার অবধি তুমি ছদ্মবেশে এবং গুপ্তভাবে তাঁর পেছনে-পেছনে থাকবে এবং যে-কোন সময়ে যে-কোন রকম আততায়ীর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করবে।

রাত্রে সলিলের বাড়ীর চারপাশে পাহারায় থাকবে। সন্দেহজনক কোন লোককে বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। সলিলের পেছনে তুমি আঠার মত লেগে থাকবে। তিনি যেখানে যান সেখানেই যাবে, এমন কি কলেজ পর্য্যন্ত। মোটকথা, তাঁকে কেউ যেন হত্যা করতে না পারে—তা'হলেই আমার কেস্ অনেকটা হাঁসিল হয়ে যাবে। মঙ্গলবারের আগে যদি আমার হুকুম পাও, তবেই একাজে ইস্তফা দিতে পারবে, নচেৎ নয়। বুঝলে ?"

কাক মাথা হেলাইয়া সম্মতি-জ্ঞাপন করিয়া কৌচ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দশ

কাক যেইমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি হঠাৎ ঘরের আলো নিভিয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে বাহিরের বারান্দা হইতে টর্চ্চের এক ঝলক তীব্র আলো জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরে একটি টেবিলের উপর পড়িয়াই নিভিয়া গেল!

জিতেন্দ্র উক্ত টর্চ্চের আলো পড়িবার সাথে-সাথেই চকিত দৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকাইয়া দেখিল যে, সেখানে একখানা সাদা খাম পড়িয়া রহিয়াছে।

টর্চ্চের আলো নিভিয়া যাইবার সাথে-সাথেই কাকের হাতের বিজলীবাতি ঐ জানালার উপর পড়িল, কিন্তু কোথায়ও কিছুই দেখা গেল না। জিতেন্দ্র ততক্ষণে দরজার পাশে দেওয়ালের সুইচে হাত দিয়া বুঝিল যে, কে সেটি টিপিয়া অফ্ করিয়া দিয়াছে!

কাহার দ্বারা কেমন করিয়া এ ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহা ভাবিয়া জিতেন্দ্র বেশ একটু আশ্চর্য্য হইল। সে তাড়াতাড়ি সুইচটিকে টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। অমনি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে সারা ঘরখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কাক ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "পালিয়েছে!"

জিতেন্দ্র টেবিলের উপর হইতে খামখানা তুলিয়া লইয়া কহিল, "চিঠি রেখে গেছে!"

খাম ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া জিতেন্দ্র দেখিল, উহাতে কাঁচা, বাঁকাচোরা হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে :—

"ইচ্ছা করিলেই মারিতে পারিতাম ; কিন্তু মারিলাম না এই মনে করিয়া যে এখন হইতে তুমি নিরস্ত হইবে।"

চিঠিখানা পড়িয়া জিতেন্দ্র কাককে শুনাইল। কাক হাসিয়া কহিল, "তা'হলে দেখছি আপনি কাজ প্রায় হাঁসিল করে ফেলেছেন ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ। চিঠিখানা দিয়ে আততায়ী পথ অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেল ; অর্থাৎ সে আমায় জানিয়ে দিয়ে গেল যে আমি অন্ধকারে হাতড়ে মরছি না, সোজা পথেই চলেছি।"

কাক কহিল, "যথার্থ।" এই বলিয়া সে দরজার দিকে পা বাড়াইল।

জিতেন্দ্র কহিল, "পিস্তল নিয়ে যাও।"

কাক ঘুরিয়া ডান হাতখানা তুলিয়া দেখাইল।

জিতেন্দ্র দেখিল, সেখানে বিরাজ করিতেছে একটি কালো রংএর চকচকে অটোমেটিক পিস্তল !

ভোরবেলায় কাগজের ক্ষুদ্র প্যাকেটটি খুলিয়া বুদ্ধদেব দেখিল উহার ভিতর রহিয়াছে পা পুঁছিবার পা পোষ হইতে কাটিয়া আনা কতকগুলি নারিকেলের সূক্ষ্ম ছোবড়া !

বুদ্ধদেব জিতেন্দ্রকে প্রশ্ন করিল, "এগুলো দিয়ে কি হবে ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "পরীক্ষা করে দেখতো, ওর ভেতর কিছু খুঁজে পাও কি না !"

বুদ্ধদেব অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "পেয়েছি।"

জিতেন্দ্র কহিল, "কি পেয়েছ ?"

"রক্ত!"

"কোথায়?"

"এই ছোবড়াগুলোর গায়ে শুকিয়ে লেগে রয়েছে!"

"কিসের রক্ত? মানুষের না পশুর?"

"সে কথা পরীক্ষা না করে বলা যায় না; তবে অনুমানে বলছি, মানুষের।"

জিতেন্দ্র কহিল, "পরীক্ষা করবো বলেই এনেছি।"

কাগজের প্যাকেটটি হাতে লইয়া জিতেন্দ্র ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করিল।

মিনিট সাতেক পর ল্যাবরেটরী হইতে বাহির হইয়া জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, মানুষের রক্ত।"

বুদ্ধদেব কহিল, "এ থেকে কি প্রমাণিত হোল?"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "সে কথা শুনবে আরো পরে।"

সেই দিনই রাত্রি দুইটা। শীতের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকারে প্লাবিত; তদুপরি কুয়াশার পুরু আবরণ ঘন রহস্যজালের ন্যায় পৃথিবীর অর্দ্ধেকটাকে অক্টোপাসের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। মৌনী তপস্বীর ন্যায় ঘুমন্ত পৃথিবী চোখ-মুখ বুজিয়া অন্ধকারের নিস্তব্ধতা উপভোগ করিতেছে। চারিদিকে বিরাজ করিতেছে একটা সুগভীর ও সুবিরাট সুষুপ্তি।

নিস্তব্ধ রজনীতে একটা ক্ষীণ আওয়াজ করিয়া বিশাল এক অট্টালিকার সর্ব্বনিম্ন কক্ষের দরজাটি খুলিয়া গেল। একটি খর্ব্বাকৃতি লোক অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত উক্ত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সদর ফটক অতিক্রম করিল ও রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল।

ফটকের অপর দিকের একটি গাছের আড়াল হইতে সেই মুহূর্ত্তে দীর্ঘাকৃতি মসীকৃষ্ণ এক মনুষ্য-ছায়া আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া উক্ত লোকটিকে অনুসরণ করিতে লাগিল। খর্ব্বাকৃতি লোকটি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ঢাকুরিয়া লেকের উপরে যে পুল, লোকটি তাহার উপর আসিয়া থামিল। অদূরে কালো ছায়াটিও গাছের এক কালো ছায়ার সঙ্গে মিশিয়া গেল।

খর্ব্বাকৃতি লোকটি দেশলাই বাহির করিয়া চুরুট ধরাইল; তারপর একটু ওদিক-এদিক তাকাইয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। পেছনের ছায়াটিও যন্ত্রচালিতবৎ আবার তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

রেল-লাইন পার হইয়া লোকটি কাঁচা মাটির রাস্তায় আসিয়া পড়িল, তারপর গ্রামের পথ ধরিয়া আঁকা-বাঁকা রাঁস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে মাইলখানেক চলিবার পর খর্ব্বাকৃতি লোকটি ঘন জঙ্গলের কাছে এক কুঁড়ে ঘরের নিকটে আসিয়া দরজায় মৃদু আঘাত করিল।

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, "কে?"

খর্ব্বাকৃতি লোকটি কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় দরজায় গুণিয়া-গুণিয়া তিনটি টোকা মারিল।

তৎক্ষণাৎ ভিতরে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং দরজা খুলিয়া একজন ষণ্ডাকৃতি বলিষ্ঠ লোক লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিল।

খর্ব্বাকৃতি লোকটি কি একটা কথা কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল! ষণ্ডার মত লোকটিও তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অদূরে ঘনান্ধকারে দাঁড়াইয়া ছায়াটিও সমস্তই লক্ষ্য

করিতেছিল। সে এইবার ঘন অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া কুঁড়ে ঘরটির কাছে আসিয়া নিঃশব্দে আড়ি পাতিয়া রহিল।

ভিতর হইতে কথাবার্ত্তার মৃদু শব্দ বাতাসে ভর করিয়া বাহিরে ভাসিয়া আসিতেছিল। কে যেন কহিতেছিল, "কাল রাত ঠিক ন'টার সময় আমাদের দু'জনকেই উপস্থিত থাকতে হবে।"

অপর ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, "কোথায় ?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "মোকামে, কর্ত্তার কাছে। এই নে চিঠি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া চিঠি লইয়া লণ্ঠনের আলোকে উহা নিঃশব্দে পাঠ করিল ; তারপর কহিল, "আবার শিকার নাকি ?"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "জানি না।"

"তবে ?"

"বলতে পারি না।"

"আচ্ছা।"

সঙ্গে-সঙ্গে সে লণ্ঠনের আলো কমাইয়া দিল।

বাইরের ছায়াটিও তখন নিঃশব্দে স্থানত্যাগ করিল ; তারপর যে পথে সে আসিয়াছিল, সেই পথেই চলিতে লাগিল।

লেকের পুল পার হইয়া ছায়াটি মানুষের আকার ধারণ করিল। লাইট-পোস্টের তলায় যে মৃদু আলো ঝরিতেছিল তাহাতে দেখা গেল যে, সে আমাদেরই বহু-পরিচিত জিতেন্দ্রনাথ !

চলিতে-চলিতে রাজা বসন্তরায় রোডের নিজ বাড়ীতে আসিয়া জিতেন্দ্রনাথ উপস্থিত হইল। তারপর জিতেন্দ্র নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

বাড়ী আসিয়া জিতেন্দ্রনাথ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার দেহ শ্রান্ত ও ক্লান্ত; আর কি জানি কেন, মনও তাহার অবসন্ন! তাহার দেহ ও মন দুই-ই যেন তখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল!

সে আলো নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল—তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে সে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইল!

এগারো

সকালে অমিয় আসিয়া জিতেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গাইল। ঘুম ভাঙ্গিতেই জিতেন্দ্র একটু কৌতূহলী হইয়া কহিল, "কি রে, ব্যাপার কী? এতো সকালে?"

অমিয় জিতেন্দ্রের খাটের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া কহিল, "সকাল ঠিক নয়, রীতিমত জ্বলজ্বলে রোদ উঠে গেছে। তুই বোধ হয় রাত জেগেছিলি, নয়?"

জিতেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তা একটু জেগেছিলাম বটে! সে যাক্, কেন এসেছিস আগে বল্, তারপর চা খেয়ে বাড়ী যা।"

অমিয় কহিল, "প্রথমটা মানবো, দ্বিতীয়টা মানবো না। আমি আজ ন'টার ট্রেনে ঝাড়ী যাচ্ছি। পিসীমার অসুখ, টেলিগ্রাম এসেছে। তোকে বলে যাচ্ছি।"

জিতেন্দ্র চঞ্চলতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ, কিছু জানতে পেরেছিস?"

অমিয় কহিল, "না, বিশেষ জানতে পারিনি। তবে তিনি অনেকদিন থেকেই বহুমূত্র রোগে ভুগছিলেন। কখন কি হয় বলা যায় না। আমাকে অন্ততঃ আজকের জন্য যেতেই হচ্ছে।"

একটু থামিয়া হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সে কহিল, "সময় নেই, কিছু ফল কিনে নিয়ে যেতে হবে, চল্লুম।"

জিতেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা আয়, কোলকাতায় এসেই দেখা করিস।"

অমিয় আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে-খাইতে জিতেন্দ্র বুদ্ধদেবকে কহিল, "আজ খুনী ধরা পড়বে অর্থাৎ ধরবো। বুঝলে বুদ্ধ ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "না বুঝবার মত কিছুই বলনি, কথাটা খুব পরিষ্কার।"

হাসিয়া জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, কথাটা পরিষ্কার বটে ; কিন্তু কাজটা ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "কাজটা ঠিক এর উল্টো অর্থাৎ ঘোরালো। কিন্তু তুমি সত্যিই আজকে খুনী ধরছো ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "তা'হলে দেখছি তুমি কথাটাকে মিথ্যে মনে করে নিয়েছো !"

বুদ্ধদেব কহিল, "তা নয়তো কি ? তুমি কি সব ঠিক করে রেখেছো ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ।"

"খুনী কে, জেনেছো ?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে সব তোমার হয়ে গেছে ?"

"সে কথা তো আগেই বললুম !"

"কখন ধরবে ?"

"রাত্রি সাড়ে ন'টায়।"

"কি আশ্চর্য্য, সাড়ে ন'টায় খুনীকে ধরবে ! একি তোমার ইচ্ছেমত ?"

হাসিয়া জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, ইচ্ছেমত।"

"খুনী নিজ থেকে ধরা দিচ্ছে না তো ?"

"তা কি কেউ কখনো দেয় ?"

"তবে ?"

"তবে আবার কি ? আমি তাকে আজকে রাত সাড়ে ন'টায় ধরছি।"

বুদ্ধদেবের মুখে হাসি ফুটিল, কহিল, "সত্যি ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "সত্যি।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

বুদ্ধদেব লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "তা' হলে তো মেরে দিলে কেল্লা !"

আশ্চর্য্য হইয়া জিতেন্দ্র কহিল, "কি রকম ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "কেন, সেই দশ হাজার টাকা ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "টাকাটাই তোমার কাছে বড় হোল ! আর আমার কৃতিত্বটা ?"

বুদ্ধদেব হাসিয়া কহিল, "রেগো না জিতুদা ! তুমি যে কৃতকার্য্য হবে, সে আমি আগে থেকেই জানতুম ; আর এও জানতুম যে, কৃতকার্য্য হওয়াটা তোমার কাছে নতুন কিছু নয়। যেটাতেই তুমি হাত দিয়েছো, সেটাতেই কৃতকার্য্য হয়েছো। তোমাকে ধন্যবাদ জানানো আমার সাধ্যে কুলোয় না।"

জিতেন্দ্র কহিল, "থাক্, হয়েছে। খুনী আর আমার ভেতর কিন্তু এখনো তেরো-চৌদ্দ ঘণ্টার ব্যবধান রয়েছে, সে কথাটা যেন খেয়ালে থাকে।"

বুদ্ধদেব কহিল, "না থাকলেও ক্ষতি নেই, কারণ এখন আমার কাছে ওটা থাকা না-থাকা সমান কথা।"

জিতেন্দ্র কহিল "আচ্ছা, এখন চুপ কর, চেঁচিয়ে কথাটাকে

সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিও না। জানতো আমাদের শিকারটি সামান্য কিছু নয়!"

দুপুরের দিকে একটা টেলিফোন আসিল। কাক কহিল, "রাতটা ভালই কেটেছে। বাড়ীতে কেউ ঢোকেও নি, বাইরেও যায়নি।"

জিতেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আজকের দিনটা এবং রাত দশটা অবধি,—ব্যস্, তারপর আর দরকার নেই। জিতেন্দ্র রিসিভার নামাইয়া রাখিল।

বিকালে চা খাইয়া জিতেন্দ্র সোজা থানায় উপস্থিত হইল।

সুধীর প্রশ্ন করিল, "কি দাদা, কতদূর গড়িয়েছো?"

জিতেন্দ্র একখানা খালি চেয়ারে উপবেশন করিয়া কহিল, "সম্পূর্ণ সমাপ্ত।"

সুধীর বিস্মিত স্বরে কহিল, "সমাপ্ত?"

জিতেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

"হত্যাকারীর খোঁজ পেয়েছো?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"প্রমাণ?"

"পেয়েছি।"

"কবে গ্রেপ্তার করবে?"

"আজকে রাত সাড়ে ন'টায়।"

"বল কি, এত শীগ্গির?"

"হ্যাঁ, এত শীগ্গির।"

সুধীর হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "হাত মিলাও দোস্ত!"

জিতেন্দ্র কহিল, "এখন নয়, সাড়ে ন'টার পর। হত্যাকারী একজন নয়, যা আগে ভেবেছিলুম তাই, অর্থাৎ তিনজন। আজ

রাত ন'টায় তিনজন একত্র হবে। তিন জনকেই গ্রেপ্তার করবো একসাথে।"

সুধীর কহিল, "তা হ'লে দেখছি তুমি বাগিয়েছো মন্দ নয়!"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, এখন চাই জনকয়েক কনস্টেবল সশস্ত্র।"

সুধীর কহিল, "বিলক্ষণ! কখন চাই?"

জিতেন্দ্র কহিল, "রাত সাড়ে আটটায় হলেই চলবে। তোমাকেও সঙ্গে থাকতে হবে। সাড়ে আটটায় তোমার বাহিনী শুদ্ধ আমার বাড়ীতে পৌঁছবে। সেখান থেকে বেশী দূরের পথ নয়।"

সুধীর কহিল, "ছদ্মবেশে যাবো?"

জিতেন্দ্র কহিল, "দরকার হবে না।"

সুধীর কহিল, "আচ্ছা, তাহলে তুমি যেতে পার; আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব।"

জিতেন্দ্র থানা হইতে যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত শীতের কুয়াশা একত্রিত হইয়া একটা গুমোট আবছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। লাইট-পোষ্টগুলিতে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু সে আলো কুয়াশার ঘন আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হইতেছে না। পথিক সাবধানে পথ চলিতেছে; কেন না, অন্ধকারের অন্তরালেই ভয় তাহার আতঙ্কের ডানা মেলিয়া পৃথিবীর সকলকে আচ্ছন্ন করিতে চায়!

বারো

রাত্রি নয়টার পর কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া ছয়জন লোক খুব তাড়াতাড়ি গরিয়াহাটার দিকে যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পর তাহারা একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার কাছে আসিয়া থামিল।

অতি সাবধানে ধীরে-ধীরে তাহারা ফটকের কাছে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন লোক ফটকেই রহিল, বাকী পাঁচজন নিঃশব্দে ফটক অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পর বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়াই তাহারা দেখিতে পাইল, বারান্দার একপাশে একখানি ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং তক্তপোষের উপর একটি লোক বসিয়া রহিয়াছে।

আগন্তুক পাঁচজনের ভিতর হইতে একজন অতি মৃদুস্বরে কহিল, "লোকটা বাড়ীর চাকর, বুঝলে সুধীর! ওর মুখ বেঁধে ফেলা চাই। কারণ, ও যদি আমাদের দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, তা'হলেই সব ফরসা!"

সুধীরের কথা কহিবার পূর্ব্বেই বুদ্ধদেব কহিয়া উঠিল, "একাজে আমি এক্সপার্ট আছি, জিতুদা! আমাকে যেতে দাও।"

জিতেন্দ্র কোমর হইতে একটা বড় রুমাল বাহির করিয়া কহিল, "এটা নিয়ে যাও, বেশ শক্ত করে আগে মুখ বেঁধে ফেল, তারপর আমরা আসছি।"

বুদ্ধদেব রুমালখানা লইয়া তাহার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলিল এবং ধীরে-ধীরে ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পর-মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর হইতে একটা মৃদু ঝটপটির আওয়াজ বাহির হইয়া আসিল, তারপর চাপা আওয়াজ হইল, "কাজ শেষ,—এসো জিতুদা!"

বাকী চারিজন লোক তাড়াতাড়ি ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। জিতেন্দ্র একটি কনষ্টেবলকে কহিল, "এটাকে খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল; একটুও নড়বার শক্তি যেন না থাকে!"

একটি কনষ্টেবল জিতেন্দ্রের আদেশানুসারে মুখ ও হাত-বাঁধা লোকটির কাছে আগাইয়া গেল এবং মোটা দড়ি দিয়া তাহাকে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর লোকটাকে তক্তপোষের পায়ার সাথে বাঁধিয়া, ঘরের আলো নিভাইয়া দিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া বুদ্ধদেব কহিল, "একি জিতুদা! আমি যাকে বাঁধলুম, সেতো অমিয়বাবুর চাকর! আমরা অমিয়বাবুর বাড়ীতে এলাম কেন?"

জিতেন্দ্র কহিল, "কেন এলে তা পরে বুঝতে পারবে। এখন কোন কথা নয়, একেবারে চুপ!"

বুদ্ধদেব আর কোন কথা কহিল না। পাঁচজন লোক নিঃশব্দে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া দোতলায় আসিল। সিঁড়ির উপর একজন কনস্টেবলকে দাঁড় করাইয়া জিতেন্দ্র বাকী তিনজনকে সঙ্গে লইয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া একটি বন্ধ ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিল।

বুদ্ধদেব ফিস-ফিস করিয়া কহিল, "পার্টির দিন এই ঘরটাই তো বন্ধ ছিল; নয় জিতুদা?"

জিতেন্দ্র কথা কহিল না; শুধু মুখে আঙ্গুল দিয়া ইসারায় বুঝাইল, "চুপ!"

দরজার এক পার্শ্বে জিতেন্দ্র, অপর পার্শ্বে সুধীর এবং মাঝখানে বুদ্ধদেব কাণ পাতিয়া রহিল। অদূরে অপর কনস্টেবলটি হাতকড়ি হাতে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ঘরের ভিতরে তখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বাহির হইতে তাহারা শুনিতে লাগিল।

কে যেন অপর কাহাকে বুঝাইতেছিল, "বুঝলে পীরু, সলিল যে আমাদের কতখানি ক্ষতি করেছে, সে কথা তো তোমাদের দু'জনকেই বললুম! আমরা অবশ্য যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে চলেছি! এমন কি, জিতু গোয়েন্দাকেও শাসিয়ে চিঠি দিয়েছি। তবুও কে জানে আমাদের পরিণতি কোথায়?

গোয়েন্দাদের আমি বেশ ভাল করেই জানি। ওরা না করতে পারে এমন কাজই নেই। সামান্য একটা সূত্র পেলেই ওরা বড়-বড় রহস্য ভেদ করতে পারে। এই ধর না কেন,—সলিল যে সামান্য কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছে, কে জানে জিতু গোয়েন্দা ঐ কথাটাকেই ভিত্তি করে আমাদের ধরে ফেলবে কি না! ভগবান্ না করুন, এইভাবে যদি আমরা ধরা পড়ে যাই, তা'হলে আমাদের ধরা পড়বার মূলে রইলো কে, বলতে পারো?"

বক্তার থামিবার সাথে-সাথেই পীরু নামধারী লোকটির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল; সে বলিল, "সলিল!"

বক্তা পুনরায় কহিতে লাগিল, "হ্যাঁ, সলিল। সলিল যদিও না-বুঝেই সত্যি কথাটাই প্রকাশ করেছে, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহ'লে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ সলিল। তোমাদের

দু'জনকে আমি যখন এই কাজে ভর্ত্তি করিয়ে নিয়েছিলুম, তখন তোমাদের কি প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, মনে আছে ?"

পীরু কহিল, "হ্যাঁ, আছে। যে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করবে, তাকে পৃথিবী থেকে বেমালুম সরিয়ে ফেলবো।"

বক্তা পুনরপি কহিতে লাগিল, "তা'হলেই দেখ, সলিলকে হত্যা না করলে তোমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যায়। আমি মনে করি, তোমাদের প্রতিজ্ঞাটা প্রাণের চাইতেও বেশী দামী। প্রতিজ্ঞা যদি রক্ষা করতে সক্ষম না হও, তা'হলে বুঝবো তোমাদের মত কাপুরুষ দুনিয়ায় দু'টি নেই।"

পীরু কহিল, "ওকি বলছেন কর্ত্তা! সলিলকে হত্যা করবার জন্য আমরা দু'জন এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত আছি। আমাদের দু'জনকে কি এই সামান্য ব্যাপারটার জন্য ডাকিয়ে এনেছেন ?"

বক্তা কহিল, "হ্যাঁ, এইজন্যেই ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তুমি যা ভাবছো তা নয়। এখন কাউকে হত্যা করা আর তত সোজা নয়। সকলেই হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। তবুও আমি জানি তোমাদের অসাধ্য কাজ নেই।"

পীরু কহিল, "হাঁ, কথাটা খুবই সত্যি কর্ত্তা!"

বক্তা কহিতে লাগিল, "তা ছাড়া ধর, যদি আমরা এই মুহূর্ত্তে সলিলের হত্যাসাধন না করি, তবে বলা যায় না, পরে সে আমাদের কতখানি ক্ষতি সাধন করবে! সে জন্যেই বলছি তোমরা এখন থেকেই প্রস্তুত হও। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর এক বছর পরে দেখবে আমরা তিনজন টাকার ওপর বসে আছি, আর আমাদের নাম সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়েছে! বুঝলে পীরু, আমাদের সার্কাস-পার্টিই হবে জগতের সেরা!"

বক্তা থামিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া গেল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই আরো কিছু শুনিবার আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

সহসা পীরুর গলার আওয়াজ শোনা গেল: "কিন্তু কর্তা, আমি তো পিস্তল আনি নাই। আপনি যদি আগে বলে দিতেন, তা'হলে ওটা সাথে করে নিয়ে আসতুম।"

পূর্ব্বোক্ত বক্তা কহিতে লাগিল, "আনোনি তাতে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি হয়নি; কিন্তু এটা মনে রেখো যে, তোমাদের সব সময় পিস্তল সাথে রাখা উচিত। বলা যায় না, কখন কোন্ বিপদ সামনে এসে দাঁড়ায়! পিস্তল থাকলে অনেক জায়গায় আত্মরক্ষা করতে পারা যায়। যা হোক, এর পর থেকে সব সময় পিস্তল সাথে রাখবে। আজকে তোমাকে আমার পিস্তলটাই দিয়ে দিচ্ছি। কোমরে ভাল করে গুঁজে রেখে, তার ওপর জামা চাপিয়ে নাও।"

বক্তা চুপ করিল। ড্রয়ার খুলিবার শব্দ হইল।

আধ মিনিট পরেই বক্তার গলার আওয়াজ আবার শোনা গেল, "এই জুতো যোড়া হাতে করে নিয়ে যাবে। বাড়ীর গেটে গিয়ে জুতো পায়ে দিবে। জুতোর তলায় রবার লাগানো আছে, কোন শব্দ হবে না। ঘরে ঢুকে গুলি করে, গেটের বাইরে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর এসে দাঁড়াবে। তারপর জুতো খুলে হাতে করে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে আসবে। এতে তোমার পায়ের কোন রকম চিহ্ন থাকবে না কোথাও!

মনে রেখো, কিছু ছোঁবে না। যতদূর সম্ভব আলগোছে বাইরে চলে আসবে। রাস্তার মোড়ে মালু আমার গাড়ী

নিয়ে অপেক্ষা করবে। গাড়ী চেপে সোজা এখানে চলে আসবে। পিস্তলটা ভাল করে গুঁজে নিয়েছো তো?"

পীরু উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কর্ত্তা!"

বক্তা কহিল, "আচ্ছা, যাও।"

বাহিরে প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান তিনটি ব্যক্তি এইবার নড়িয়া উঠিল।

জিতেন্দ্র ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল, "পিস্তল উঁচিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকো। সাবধান, আগেই গুলি ছুঁড়ো না। আমার হুকুম অনুসারে কাজ করবে।"

তিনটি প্রাণী মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া একটা বিরাট কিছুর যবনিকা-উত্তোলনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল!

তেরো

দরজার খিল খুলিবার শব্দ হওয়ার সাথে-সাথেই জিতেন্দ্র সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিয়াই পিস্তল উঁচাইয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া কহিল, "সাবধান! জায়গা থেকে একপাও নড়েছ কি মরেছ!"

সুধীর ও বুদ্ধদেব ভিতরে প্রবেশ করিয়াই পীরু ও মালু নামীয় লোক দুইটির দিকে পিস্তল উঁচাইয়া ধরিল। দরজার ধাক্কা খাইয়া পীরু সশব্দে ঘরের মেঝেতে পড়িয়া গিয়াছিল। উঠিয়া পিস্তল বাহির করিবার সময় পায় নাই।

জিতেন্দ্র তাড়াতাড়ি ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর সুইচের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কারণ, হঠাৎ যদি কেহ সুইচ্ টিপিয়া আলো নিভাইয়া দেয়, তাহা হইলে হয়ত সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে!

জিতেন্দ্র যাহার দিকে পিস্তল বাগাইয়া ছিল, বুদ্ধদেব সবিস্ময়ে দেখিল সে আর কেহই নহে, জিতেন্দ্রের বন্ধু শ্রীযুত অমিয়কুমার!

বাহির হইতে রামদীন কনষ্টেবল ভিতরে প্রবেশ করিল।

জিতেন্দ্র কহিল, "হাতকড়া লাগাও।"

রামদীন একে-একে তিনটি লোকের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া দিল।

পীরুর কোমর হইতে জিতেন্দ্র পিস্তলটি টানিয়া লইয়া নিজের প্যাণ্টের পকেটে রাখিল; তারপর অমিয়র দিকে

উঁচান পিস্তলটি অপর পকেটে রাখিয়া কহিল, "বুঝলে বুদ্ধু, খুনী আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এই অমিয়কুমার এবং মালু ও পীরু খাঁ!"

বুদ্ধদেবের মুখে কথা সরিতেছিল না! সে হতবাক্ হইয়া অমিয়র দিকে তাকাইয়া ছিল। সে স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারে নাই যে, এত-বড খুন হইয়াছে তাহাদেরই এক জন বিশ্বস্ত বন্ধু এই অমিয়র দ্বারা!

অমিয়র মুখে ভয়, বিস্ময় এবং রাগের চিহ্ন এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দেখিলে যে-কোন একটা হিংস্র অথচ ভয়ার্ত্ত বন্য পশুর মুখের দৃশ্য চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে! মালু ও পীরু খাঁ হতবাক্ হইয়া মাটিতে বসিয়া ছিল। তাহারা এতখানি বিস্মিত হইয়াছিল যে, সম্মুখে হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও মানুষ ততখানি বিস্মিত হয় না!

জিতেন্দ্র পকেট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া কহিল, "গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে, তিনটি লোককে হত্যা করার অপরাধে, তোমাদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলুম।"

রামদীন উহাদের তিনজনের কোমরে তিনটি মোটা দড়ি বাঁধিয়া দিল। নীচ হইতে তখন অপর দুইজন কনষ্টেবলও আসিয়াছিল। রামদীন দড়ি তিনটির একটি নিজের হাতে রাখিয়া অপর দুইটি কনষ্টেবল দুইটির হাতে দিল।

জিতেন্দ্র কহিল, "ঘরখানা বেশ বড় আছে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ার টেনে বসা যাক্, কি বল সুধীর?"

সুধীর কিছু না বলিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া জিতেন্দ্রের পাশে বসিয়া পড়িল!

জিতেন্দ্র ঘরের চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, "ঘরটাকে সাজিয়েছে বেশ, কি বল বুদ্ধু?"

বুদ্ধদেব কহিল, "এক্সপেরিমেণ্টাল ল্যাবরেটরী মনে হচ্ছে।"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "মনে হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ, এটা সত্যি-সত্যিই এক্সপেরিমেণ্টাল ল্যাবরেটরী রুম্। এ-ঘরে কি-কি, আছে তা আমাদের একবার দেখা দরকার।"

এই বলিয়া জিতেন্দ্র উঠিল এবং একটা কাঠের আলমারীর সামনে গিয়া কহিল, "চাবিটা দাও তো অমিয়!"

অমিয়র ইসারায় বুদ্ধদেব টেবিলের উপর হইতে চাবি আনিয়া জিতেন্দ্রের হাতে দিল।

আলমারী খুলিতেই জিতেন্দ্র দেখিতে পাইল, তিনটি শেল্‌ফে বড়-বড় তিনটি কাচের পাত্র, তাহাদের ভিতর তিনটি ছিন্নমুণ্ড স্পিরিটের মধ্যে ডুবানো রহিয়াছে!

জিতেন্দ্র একে-একে পাত্র তিনটি আলমারী হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তারপর কহিল, "আমার ধারণা ছিল, অমিয় মাথাগুলোকে ম্যমিতে পরিণত করে রাখবে; যাক্ স্পিরিটের ভিতরে ডুবিয়ে রাখাও প্রায় একই কথা, কি বল বুদ্ধ?"

বুদ্ধদেব কিছু কহিল না, শুধু নীরবে মাথা নাড়িল।

জিতেন্দ্র তাহার সম্মুখে একটা কাচের শেল্‌ফের দিকে আগাইয়া গেল। তারপর তাহারা দেরাজ খুলিয়া উহার ভিতর হইতে ছোট আকারের তিনটি কাচের এয়ার-টাইট্ ফ্লাস্ক বাহির করিল। ফ্লাস্ক কয়টির গায়ে লেবেল্ আঁটা ছোট কাগজে লেখা রহিয়াছে—"Human Brain বা মানুষের মস্তিষ্ক!"

ফ্লাস্কের ভিতরে সত্যই মগজের অস্তিত্ব পরিষ্কার বুঝা গেল।

জিতেন্দ্র কহিল, "ঐ তিনটি ছিন্ন মুণ্ডের মগজ এই তিনটি ফ্লাস্কের ভেতর রয়েছে, দেখ সুধীর!"

তারপর সে মগজের পাত্র তিনটি সযতনে টেবিলের উপর

রাখিয়া নিজের আসন টানিয়া লইয়া কহিল, "ঐ বড় ডেস্ক্-আলমারীর ভেতর অন্যান্য যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম আছে; কিন্তু আমাদের ওসব ঘেঁটে লাভ নেই, যা পেয়েছি তাতেই কাজ হয়ে যাবে।"

বুদ্ধদেব এতক্ষণ অমিয়কে পলকহীন চোখে ভালরূপে দেখিতেছিল। অমিয়র চেহারার সঙ্গে কাকের বর্ণিত একটা চেহারার যেন সাদৃশ্য বিদ্যমান! বর্ণ গৌর, আকৃতি দীর্ঘ, চোখে সোণার ফ্রেমওয়ালা চশমা, গায়ে সার্জ্জের পাঞ্জাবী এবং হাতে একজোড়া পশমী দস্তানা! পীরু খাঁকে কাকের বর্ণিত সেই বেঁটে লোকটার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কারণ, পীরু খাঁ'র দৈর্ঘ্য চারফুটের অধিক নহে, বর্ণ ঘোর কালো, চুল সম্মুখে বড় পেছনে ছোট এবং চক্ষু দু'টিতে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট! মালু মিঞার চেহারাটা অনেকটা অমিয় ও পীরুর মাঝামাঝি বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না।

বন্দী তিনজনেই স্তিমিত নয়নে নিঃশব্দ হইয়া ছিল; কারণ, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের লীলাখেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও ইহার আর কোন অন্যথা হইবে না।

জিতেন্দ্র আবার উঠিল। উঠিয়া ঘরের ভিতরকার বইয়ের আল্‌মারীটার কাছে অগ্রসর হইল এবং শেল্‌ফের বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা ডায়েরীর মত বই বাহির করিয়া কহিল, "পাওয়া গেছে।"

বুদ্ধদেব প্রশ্ন করিল, "কি?"

জিতেন্দ্র কহিল, "একখানি ডায়েরী—অমিয়র নিজস্ব ডায়েরী! এতে অনেক জিনিষ আছে—" এই বলিয়া সে নিজের আসনে আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ ডায়েরীর পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া জিতেন্দ্র হঠাৎ মুখ তুলিয়া অমিয়র দিকে তাকাইয়া কহিল, "তারপর অমিয়! সকালবেলাতেই বোধকরি তোমার পিসীমার ভাল হওয়ার খবরটা পেয়ে গেলে! কি বল?"

অমিয় জিতেন্দ্রের রসিকতা বুঝিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

আর কথা কহিবেই বা কি? যে সর্ব্বনাশ তাহার হইয়া গিয়াছে, সে চিন্তাই যে তাহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল! এতদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম-সহকারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে যে অসম্ভব কাজটিকে সে সম্ভবে পরিণত করিতে চলিয়াছিল, সে কাজটির মূলে এমন আকস্মিক ভাবে কুঠারাঘাত হওয়ায় তাহার মনের ভিতর তখন যেন তূষের আগুন জ্বলিতেছিল! এই তুষানলের অসম্ভব জ্বালা তাহার শরীরটাকে তখন এমন ভাবে পোড়াইতেছিল যে, যে-কোন মুহূর্ত্তেই সে যেন ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে, এমনই আশঙ্কা হইতেছিল!

জিতেন্দ্র অমিয়র দিকে তাকাইয়া তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। কারণ, মানুষের হাব-ভাব দেখিয়া তাহার মনের ভিতরের কথা বুঝিতে পারা তাহার পক্ষে কঠিন কিছুই নহে।

জিতেন্দ্র ঘুরিয়া বুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এই ঘরে যত সব আস্তাকুঁড়ে ফেলবার উপযুক্ত জঞ্জাল দেখছো, এগুলো অমিয়র পিসীমা বাইরে ফেলে দিতে নারাজ। তাই অমিয় এগুলো এই ঘরে বন্ধ করে রেখেছে!"

বুদ্ধদেবও রহস্য করিয়া কহিল, "আস্তাকুঁড়ে ফেলবার উপযুক্ত জঞ্জাল? যথা?"

জিতেন্দ্র কহিল, "যথা—দামী-দামী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি!"

বুদ্ধদেব কোন-কিছু কহিবার পূর্ব্বেই অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট অমিয় সশব্দে মেঝেতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞা হারাইল!

সুধীর চেঁচাইয়া কহিল, "কি হোল?"

জিতেন্দ্র একটুও ব্যস্ত না হইয়া কহিল, "বেশী মাত্রায় উত্তেজিত হলে মানুষের মাঝে-মাঝে ওরকম ফিট্ হয়েই থাকে। তবে এটা সাময়িক এবং হওয়াও ভাল। আমি ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, এরকম একটা কিছু হবে। এর পর সুস্থ হয়ে উঠলে, ভাল মানুষের মত কথা বলতে পারবে। রামদীন, তুমি বাথরুম থেকে বালতী করে জল এনে আস্তে-আস্তে ওর মাথায় ঢালতে থাক।"

মিনিট পনেরো পরেই অমিয় সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

জিতেন্দ্র কহিল, "কিছু মনে করো না অমিয়, কর্ত্তব্যের দায়ে আমাকে এসব করতে হয়েছে। তুমি তো জানই,—যে দোষী, আইন অনুসারে তার দণ্ড অনিবার্য্য! এ দণ্ড থেকে একমাত্র ভগবান্ ছাড়া কেউ তোমায় রেহাই দিতে পারবে না। আর তুমি যে অপরাধ করেছ, তার শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না! তুমি আইন জান, এবং জেনেও এত-বড় অপরাধ করেছ। আমার ওপর রেগো না অমিয়! কারণ, তুমি ছাড়া অন্য কেউ হলেও আমি তাকে ছাড়তুম না!"

চৌদ্দ

জিতেন্দ্র যে কেমন করিয়া এত-বড় একটা রহস্যের যবনিকা উত্তোলন করিল, তাহা শুনিবার জন্য বুদ্ধদেব এবং সুধীর বসু উভয়েই নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিল।

জিতেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "অত ব্যস্ত হয়ো না, সব বলবো। প্রত্যেকবার যেরকম বলে এসেছি, এবারও সেই রকম বলবো, ধৈর্য্য ধর।"

বুদ্ধদেব হাত-ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, "কিন্তু রাত তো বেড়ে চললো; দশটা বেজে গেছে।"

জিতেন্দ্র হাসিল, কহিল, "রাত কারো জন্য বসে থাকে না। তাকে যেতে দাও। আটকাতে গেলেই বিপদ বাড়বে!"

বুদ্ধদেব চুপ করিয়া রহিল।

জিতেন্দ্র পুনরপি কহিল, "অমিয়র জামার পকেটগুলো একটু সার্চ্চ করে এসো তো বুদ্ধ, বে-আইনী বা মারাত্মক কিছু পাও কিনা! আত্মহত্যার লিপ্সাটা এরকম সময় মানুষের মনে সাধারণতঃ জেগে ওঠে কিনা, তাই বলতে বাধ্য হলুম।"

বুদ্ধদেব উঠিয়া গিয়া অমিয়র পকেট সার্চ্চ করিল কিন্তু কিছুই পাইল না।

জিতেন্দ্র কহিল, "এইবার ভাল হয়ে বসে শোন বুদ্ধ, তুমিও শোন সুধীর!"

জিতেন্দ্র কহিতে লাগিল, "এ ব্যাপারে জড়িত হওয়ার পর অমিয়র সাথে প্রথম আমার দেখা হয় দৈবাৎ—রাসবিহারী

এভিনিউয়ে ঢুকবার মোড়ে। রাত তখন বোধকরি সোয়া-তিনটের একটু বেশী হয়ে গেছে। কোলকাতার রাস্তায় রাত দেড়টা অবধি প্রাইভেট গাড়ীর সাধারণতঃ চলাচল থাকে ; কিন্তু নেহাৎ কোন জরুরী ভাল কাজ কিংবা কোন খারাপ কাজ ঘাড়ে না পড়লে কেউ কখনো রাত সোয়া-তিনটের সময় ওরকম রাস্তায় গাড়ী চালায় না।

আমার গাড়ীর ওপরে এসে পড়তে-পড়তে অমিয়র গাড়ীখানা থেমে গেল। আমার গাড়ীটা আগে অমিয় দেখতে পায়নি ; দেখতে পেলে সে কখনো আমার গাড়ীর সামনে এসে পড়তো না। আমি যে গাড়ী নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে তখন যাবো, তাও সে একদম ভাবতে পারেনি। আমি রাস্তার মোড়ে কোন হর্ণ বাজাইনি, দ্বিতীয়তঃ ব্ল্যাক্‌আউটের রাত বলে আমার গাড়ীর হেড্‌-লাইট্‌ থেকে বেশী আলোও বেরুচ্ছিল না। তাই হঠাৎ অমিয়র গাড়ী এসে আমার গাড়ীর গায়ে প্রায় ধাক্কা খেতে-খেতে থেমে যায় !

অমিয়র গাড়ীতে তখন প্রফেসারের কাটা মাথাটি লুকানো ছিল। সে মাথা কেটে নিয়েই হয়তো কোথাও কোন কাজের জন্য গিয়েছিল এবং কাজ সেরে ঐ রাস্তা দিয়ে তখন বাড়ী ফিরছিল।

আমি যখন বুদ্ধুকে গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে ঐ গাড়ীর নম্বরটা টুকে নিতে বললুম, তখন অমিয় একটু ভয় পেয়ে গেল ; কারণ, প্রথমতঃ—তার গাড়ীর ভেতর পা-রাখবার পাপোষের ওপর ছিল মাথার বাস্কটা। বুদ্ধদেব নম্বর টুকতে এসে যদি ভেতরে কে আছে দেখবার জন্য হঠাৎ একটা উঁকি দেয়, তা'হলে হয়তো ঐ বাস্কটা তার চোখে পড়ে যেতো ! কাজেই সে ভয় পেয়ে গেল এই মনে করে যে, বুদ্ধু যখন

আমার সঙ্গে এতো রাতে বেরিয়েছে তখন নিশ্চয়ই এই তদন্ত-ব্যাপারে!

গোয়েন্দাদের অমিয় ভাল করেই জানে। সুতরাং সে ভাবলে যে, এতো রাতে অকস্মাৎ দেখা—তার ওপর তার মোটর-গাড়ীতে যদি ঐ রকম একটা বাস্ক বুদ্ধুর চোখে পড়ে যায়, তা'হলে হয়তো বুদ্ধু গোয়েন্দার মনে কোনরকম একটা সন্দেহের রেখাপাত হতে পারে! তাই সে যাতে বুদ্ধদেবকে গাড়ী থেকে নামতে না হয়, সেজন্য তাড়াতাড়ি নিজেই কন্‌কনে শীতের ভেতরে নেমে পড়ে আমার সাথে কথা বলে। ওর সাথে বন্ধুত্ব আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। কাজেই আমার গলার আওয়াজেই সে আমাকে চিনতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়তঃ—তার ভয় পেয়ে যাবার আরো একটা কারণ ছিল। তার মনে একটা আশঙ্কা হয়েছিল যে, তার গাড়ীর নম্বরটা যদি থানায় পেশ করা হয়, তা'হলে তাকে পরে একটা দারুণ হাঙ্গামার ভেতর পড়ে হয়ত বেশীরকম নাস্তানাবুদ হতে হবে,—ধরাও পড়ে যেতে পারে! কারণ, অত রাত্রে গাড়ী নিয়ে রাস্তায় ঘোরার কারণ পুলিশে নানারকম জেরা করে বের করতে চেষ্টা করবে। তাই সে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে একূল-ওকূল দু'কূলই রক্ষা করেছিল।

আমি যে এখন এসকল কথা বলছি, তোমরা ভেবো না যে, সেদিন সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে এই সব কথার উদয় হয়েছিল। এসব বিষয় আমি ভেবেছি আরো পরে, যখন অন্য প্রমাণ পেয়েছি। যা হোক্, সব স্পষ্ট করে বলে যাচ্ছি, প্রমাণও দিয়ে যাবো; তোমরাও বুঝতে পারবে।"

জিতেন্দ্র একটু থামিয়া আবার কহিয়া যাইতে লাগিল, "আমার প্রশ্নে অমিয় বললো যে, তার পার্টির নেমন্তন্ন করতে-করতে অত রাত হয়ে গেছে এবং সে তখন তার এবং আমার উভয়ের বন্ধু সলিলের বাড়ী থেকে ফিরছে।

আমি কথাটা অম্লানবদনে বিশ্বাস করে গেলুম এবং দ্বিরুক্তি না করে গাড়ী চালিয়ে দিলুম। এর পর তদন্তের কাজ শেষ করে ভাঙ্গা মীনাটুকু পকেটে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু তখনো আমার মনে অমিয়র সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ স্থান পায়নি।"

জিতেন্দ্র চুপ করিল।

বুদ্ধদেব কহিল, "থামলে কেন ?"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "কথাগুলো গুছিয়ে বল্‌তে হলে সময় ও বিশ্রাম,—দুইই দরকার, বুঝলে ?"

বুদ্ধদেব কহিল, "কথা বলতে-বলতে তোমার তো আবার জল খাওয়ার অভ্যাস আছে। আনিয়ে দেবো ?"

জিতেন্দ্র কহিল, "তা'হলে মন্দ হতো না।"

একটা কনস্টেবল জল আনিবার নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া গেল। জল আসিল।

জিতেন্দ্র আবার আরম্ভ করিল, "তার পরদিন অমিয়র বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললুম। এটাই বোধকরি হয়েছিল অমিয়র কাল। খাওয়া-দাওয়া ফুর্ত্তি সব-কিছুই করা হোল। তারপর আমার কথায় অমিয় এসে আমায় অনুরোধ করলো তার বাড়ী দেখে যাওয়ার জন্য। বাড়ীটার নক্সাটা সে আমায় বাড়ী তৈরীর আগে দেখিয়েছিলো কিন্তু বাড়ী তৈরী হওয়ার পর তা দেখা আর আমার পক্ষে ঘটে ওঠেনি।

যাহোক্ অমিয় তো আমাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাড়ী দেখাতে লাগলো। কিন্তু এই ঘরের পাশের বারান্দাটার মোড়ের কাছে এসে মোড়ে না ঢুকে সোজা চলে যেতে চেয়েছিল। আমি ভাবলুম, এটা বাদ থাকছে কেন? তাই বললুম যে, এ-দিকটাও দেখে যাই। অগত্যা সে মোড় ঘুরলে।

কিন্তু এই ঘরের কাছে এসেই হোল যত বিপদ্! ঘরটা ছিল বন্ধ, বুঝলে সুধীর!

আমি বললুম যে বন্ধ রাখার কারণ কি? সে বেমালুম মিথ্যে বলে দিল যে, এটা জঞ্জাল রাখবার ঘর!

আমি অমিয়র রুচি দেখে একটু বিস্মিত হলুম এবং হাসলুম; কিন্তু কোনরকম সন্দেহ আমার মনে স্থান পেল না। পাওয়া উচিতও নয়; কারণ, প্রথমতঃ, সে আমার বন্ধু; দ্বিতীয়তঃ, ভিত্তিহীন সন্দেহের কোন মূল্যই নেই। যাহোক্, তখন আমার আর-এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল; অতএব আমি তৎক্ষণাৎ বিদেয় নিলুম।

কিন্তু গাড়ীতে ওঠবার সাথে-সাথেই আমার সলিলের কথা মনে পড়লো। তাকে তো পার্টিতে দেখতে পেলুম না! যার সাথে সলিলের আগের দিন রাত তিনটে অবধি আলাপ হয়েছে, তার পক্ষে নেমন্তন্নটা রক্ষা না করা কোন দিক দিয়েই সঙ্গত নয়। বুদ্ধু বললো যে, সে হয়তো আগেই এসে চলে গেছে! আমি আর গাড়ী থেকে নেমে অমিয়কে সে কথা জিজ্ঞেস করলুম না। কারণ, আমার হাতে সময় ছিল কম, অতএব গাড়ী চালিয়ে দিলুম।

বাড়ীর কাছে বুদ্ধুকে নামিয়ে দিয়ে আমি আমার কাজে চললুম।

কাজ সেরে ফেরবার সময় সলিলের বাড়ীটা রাস্তায় পড়ে

গেল। ভাবলুম, একটা খোঁজ নিয়ে যাই, যদি কোন অসুখ-বিসুখ করে থাকে!

বাড়ীতে ঢুকলুম। দেখলুম, সে গা থেকে জামা-কাপড় খুলছে। বললুম, 'কি হে, কোত্থেকে এলে?'

সে বললো, 'তুমি এলে কোত্থেকে?'

আমি তার কথার উত্তর দিয়ে বললুম, 'তুমি পার্টিতে গেলে না কেন?'

সে যেন একটু চিন্তা করে বললো, 'কার পার্টিতে?'

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, 'বাঃ, কাল রাত তিনটে অবধি অমিয়র সাথে তোমার আলাপ হোল, অথচ আজ বলছো, কার পার্টি? এ কেমন কথা হে?'

সলিল যেন একটু বিস্মিত হয়ে বললো, 'আজকে অমিয়র পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিল বটে কিন্তু কাল রাত তিনটে অবধি তার সাথে আমার আলাপ হয়েছে একথা তোমায় বললে কে?'

আমি বললুম, 'কেন, অমিয়!'

সে বললো, 'মিথ্যে বলেছে, আমার সাথে তার কাল সারা দিন-রাতে একবারও দেখা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, আমার আজকে আর একটি জরুরী এন্‌গেজমেণ্ট ছিল বলেই ওর পার্টিতে যেতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ওর পার্টির কথাটা আমার মনেও ছিল না! এই তো সবে আমি আমার কাজ সেরে ফিরলুম!'

আমি বললুম, 'তাতো দেখতেই পাচ্ছি. কিন্তু অমিয় তা'হলে আমায় ওকথা বললো কেন?'

সে বললো, 'কি জানি! আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না!'

আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ এসে উঁকি দিল। কেমন

যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম! ভাবলুম, অমিয় আমার কাছে এতবড় মিথ্যে কথা বললো কেন? ভাবতে-ভাবতে মন-মরা হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

• বুঝ্তে বোধ হয় মনে আছে যে তুমি আমায় সেদিন নিতান্ত মন-মরা দেখেছিলে এবং আমি তোমার প্রশ্নের কোন-রকম উত্তর দিতে রাজী ছিলুম না! একটিমাত্র কথা না কয়ে আমি সে রাতটা কাটিয়ে দিলুম।"

জিতেন্দ্র থামিয়া জলের গ্লাস তুলিয়া এক চুমুক জল খাইয়া লইল।

পনেরো

জিতেন্দ্র আবার কহিতে লাগিল, "রাতটা কাটিয়ে দিলুম বলেছি, কিন্তু কেমন করে কাটিয়েছি সে কথা বলা দরকার! চিন্তা—বুঝলে বন্ধু, কেবল চিন্তা করে কাটিয়েছি!

ঘুম সেদিন অনেক দূর চলে গিয়েছিল।

শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম যে, অমিয় আমার কাছে এতবড় মিথ্যে কথা বললো কেন? যদি সত্যি-সত্যিই মিথ্যে কথা বলে থাকে, তবে সেদিন অত রাত্রে সে কোত্থেকে আসছিল? নিশ্চয় কোন কাজ সেরে আসছিল এবং সে কাজ হয়তো প্রকাশযোগ্য নয়। যদি প্রকাশযোগ্য হোত, তা'হলে সে আমার কাছে অতবড় মিথ্যে কথা বলতো না। তবে নিশ্চয় সে এমন কোন ব্যাপারে লিপ্ত আছে যা নাকি সাধারণের কাছে সে গোপন রাখতে চায়।

অমিয় ভদ্রলোকের ছেলে,—বিদ্বান্, অর্থবান্ এবং চরিত্রবান্ও বলা চলে; কারণ ওর সাথে আমি বহুদিন কাটিয়েছি। কিন্তু ওর পক্ষে কি কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা সম্ভব?

হয়তো—না। কিন্তু না-ই বা বলি কেমন করে? অত রাত্রে আকস্মিক ভাবে দেখা, এবং কোত্থেকে আসছে জিজ্ঞেস করায় বললো একটা দারুণ মিথ্যে কথা! এ ব্যাপারটা কি সন্দেহজনক নয়?

এইভাবে অমিয়র ওপর আমার সেদিন একটা সন্দেহ হয়ে গেল। তারপর মনে পড়ল সেদিনের পার্টির কথা। অমিয় এই

ঘরটার সামনের বারান্দা দিয়ে আসতে চায় নি। অবশ্য তখন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। এখন মনে হতে লাগলো যে, অমিয় এ বারান্দায় আসতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করলো কেন?

যাহোক, বারান্দায় তো আমার জন্য আসতে বাধ্য হল কিন্তু এই বন্ধ ঘরের সামনে এসে ঘরটা আমাকে দেখাতে চাইল না, —একটা ওজর দেখালো, 'এটা আবর্জ্জনার ঘর!'

এর আগে অন্য ঘরগুলো সে বেশ ভালো করেই দেখিয়েছে কিন্তু এঘরটা যখন দেখতে চাইলুম, তখন বললে কি না যে, বাড়ীর যতসব জঞ্জালের স্থান এই কক্ষে! অথচ ঘরটা যে কি রকম ফ্যাশান্-করা ঘর, আর বাড়ীর কি রকম জায়গায় অবস্থিত,—তাতো দেখতেই পাচ্ছ!

এরকম ঘরে জঞ্জালের স্থানটা একটু অস্বাভাবিক মনে হয়না? আমারও হয়েছিল; কিন্তু আমি তখন কথাটা সত্যি বলেই ভেবেছিলুম আর অমিয়র রুচিকে মনে-মনে ধিক্কার দিয়েছিলুম। কিন্তু রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবলুম যে অমিয় যখন আমার কাছে আগেই একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে কথা বলেছে, তখন তার পক্ষে আর-একটা মিথ্যে কথা বলা একটুও অসম্ভব নয়। তখন আমার মনে হোল যে, এ ঘরে জঞ্জালের অস্তিত্ব নেই; আছে এমন কিছু যা নাকি সে গুপ্তভাবে রাখতে চায়।"

জিতেন্দ্র চুপ করিল।

সুধীর কহিল, "বেশ লাগছে কিন্তু!"

জিতেন্দ্র কহিল, "হ্যাঁ, তা লাগবারই কথা!"

বুদ্ধদেব কহিল, "থামলে কেন? বলে যাও।"

জিতেন্দ্র আবার কহিতে লাগিল, "বন্ধুকে সন্দেহ করলুম বটে কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলুম না। আরো প্রমাণের অপেক্ষায় বসে রইলুম। প্রমাণ ছাড়া কোন কাজে হাত দেওয়া

আমাদের অভ্যাস নয়। অবশ্য বিনা প্রমাণেও আমরা যাকে-তাকে সন্দেহ করি; কিন্তু সে সন্দেহটা ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে-মনেই পোষণ করি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রমাণ এসে তাকে ভিত্তির ওপর স্থাপিত করে।

আচ্ছা, এখন আসা যাক্ প্রফেসারের মৃতদেহের ঘরে।

সে ঘরটা কেমন ভাবে পরীক্ষা করি, ও কি সেখানে পাই, তা তোমরা জান। খাটের নীচে যে হাত ও পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলুম, তা হচ্ছে এই পীরু খাঁর। প্রফেসার মশাই ঘুমুলে পরে ও নিঃশব্দে দোর খুলে রেখে বেরিয়ে যায়। অমিয় পরে সেই খোলা দোর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল।

সলিলকে খুন করতে পাঠাবার বেলায় অমিয় তাকে কোন রকম চিহ্ন না রেখে আসবার জন্য খুব সতর্ক করে দিচ্ছিল, তা তোমরা দরজার আড়াল থেকেই শুনেছ; কিন্তু প্রফেসারের কক্ষে যদি ওরকম সাবধানতা অবলম্বন করতো তবে হয়তো আমার পক্ষে একটু অসুবিধের সৃষ্টি হোত। যাহোক, তখন তারা ভাল রকম সাবধানতা অবলম্বন করেনি বলেই খাটের নীচে রেখে গেল হাত ও পায়ের ছাপ, আর খাটের ওপর রেখে গেল,—যা সেখানে তোমাদের কাউকে বলিনি—এক টুক্‌রো ভাঙা মীনে।

মীনের টুক্‌রোটা তোমাদের অগোচরে আমি পকেটে করে নিয়ে নিলুম। আর তার পরদিন ফোন করে বড়-বড় জুয়েলার-দোকানগুলোতে জানিয়ে দিলুম যে, যদি কোন মীনে-ভাঙা আংটি দোকানে কেউ সারাতে দিয়ে যায়, তাহলে যেন আমাকে জানানো হয়।

সেদিন কোন দোকানেই সেই আংটির কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। মনে, ভাবলুম হয়তো দু'দিন বাদেই পাওয়া যাবে।

তবে মনে-মনে একথাটাও ভেবেছিলুম যে, আততায়ী হয়তো সতর্ক হয়ে এখনই দোকানে আংটি নাও সারাতে দিতে পারে ; সুতরাং আমার পক্ষে বসে থাকাটা কোন দিক থেকেই শ্রেয়ঃ নয়। অতএব অন্য পন্থা অনুসরণ করলুম।

চোর, ডাকাত এবং খুনীদের স্বভাব এই যে, যেখানে তারা চুরি-ডাকাতি বা খুন করে, দু'-তিন দিন ধরে তারা সে জায়গার আশপাশ দিয়ে ভালো মানুষের মত ঘুরে বেড়ায়। এটা তাদের আত্মরক্ষার একটা প্ল্যান মাত্র। তারা দেখতে বা শুনতে চায় যে, সেখানে পুলিশ অথবা জনসাধারণ কি করে বা কি বলে

আমি এমন একটা কেস্ জানি। একবার এক বাড়ীতে শেষ-রাতে ডাকাতি হয়। পরদিন সকালে বাড়ীতে পুলিশ আসে। বাড়ীর চারপাশে লোক জড়ো হয়ে যায়। সেই সব লোকের ভেতর আমাদের ডাকাতটিও ছিলেন। পুলিশের সাথে তিনি ভালো মানুষের মত কথাবার্ত্তা বলছিলেন এবং তাদের তদন্ত-ব্যাপারে একটু-আধটু সাহায্যও করছিলেন, যা সাধারণতঃ জনসাধারণ করে থাকে। এইভাবে তিনি আত্মরক্ষার উপায় তৈরী করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষে অবশ্য সেই মহাত্মাকে আমার হাতেই ধরা পড়তে হয়েছিল! যাক্, আমার মনে তাই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, খুনী যেখানে খুন করেছে, সেখান দিয়ে নিশ্চয় সে দু'তিন দিন পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াবে ; কিন্তু খুনী ছাড়াও তো অনেকে ঘুরবে! তার ভেতর থেকে খুনীকে কেমন করে বেছে নেওয়া যাবে ?

মনে-মনে একটা প্ল্যান আঁটলুম। খুনীর বিরুদ্ধে একটা ইস্তাহার লিখে 'দানচাঁন্দ লালচাঁন্দ ব্রাদার্স' দোকানের সামনে একটা পোস্টে লাগিয়ে দেবার মতলব করলুম। অন্য কোন

রাস্তার ধারের পোস্টে না লাগিয়ে, বিশেষ করে ঐ দোকানের সামনে লাগিয়ে দেবার মতলব আঁটারও একটা মানে আছে।

এটুকু জানতুম যে, আততায়ী ঐ রাস্তার ধার দিয়ে কয়েকদিন বেশ একটু ঘোরা-ফেরা করবে আর দোকানের ওপর একটু নজর রাখবে। দোকানের দিকে নজর দেওয়ার সাথে-সাথেই পাশের পোস্টের কাছে লোকের ভীড় দেখলে তার মনে স্বভাবতঃই একটু ঔৎসুক্য জন্মাবে; তখন সে পোস্টের কাছে আসবে ও ইস্তাহারটা পড়বে। পড়ার পর তার মনে হবে একটু আশঙ্কা এবং সে তখন ওটা ছিঁড়ে ফেলবার চেস্টা করবেই।

আমি আগেই ধারণা করে নিয়েছিলুম যে আততায়ীরা তিনজন। তার ভেতর একজন হচ্ছে Leader বা দলপতি। দলপতি যে ধনী ও বিলাসী, তা আমি ভাঙা মীনের টুকরো দেখেই বুঝে নিয়েছিলুম। কাজেই স্থির করলুম—লোকটি নিশ্চয়ই হেঁটে ঘোরা-ফেরা করবে না, ঐ রাস্তা দিয়ে সে মোটরেই যাতায়াত করবে। ইস্তাহারটা ছিঁড়বার চেস্টা করতে হলে তাকে বাধ্য হয়ে ঐ রাস্তা দিয়ে দু'-তিনবার যাতায়াত করতে হবে। কারণ, সে নিরিবিলি ও ফাঁক খুঁজবে।

যে রাস্তাটায় ঐ দোকানটা অবস্থিত, সে রাস্তা দিয়ে যে প্রাইভেট মোটর-গাড়ী খুব বড়-বেশী যাতায়াত করে না, তা আমি জানি। করলেও একটি গাড়ী দু'-একবারের বেশী ঐ রাস্তা দিয়ে নিশ্চয় যাবে না। অথচ আততায়ীকে বাধ্য হয়ে মোটর হাঁকিয়ে দু'-চারবার ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে হবেই। সুতরাং এই ফাঁকে যদি আমি ঐ মোটর-গাড়ীর নম্বরটা জেনে নিতে পারি, তা'হলে আমার পক্ষে মস্ত-বড় একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়।

আমার একটি প্রাইভেট লোক আছে, যাকে আমি ও বুদ্ধু ছাড়া আর কেউ জানেও না, চেনেও না! আমি তাকেই এ-কাজে নিযুক্ত করলুম।

সে পাগল সেজে ঐ রাস্তার ধারে বসে রইলো এবং যে সকল গাড়ী ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে লাগলো তাদের নম্বরগুলো টুকতে লাগলো। এই ভাবে রাত দশটা অবধি অপেক্ষা করে আমার নিযুক্ত লোকটি একটি মোটরের নম্বর আমায় ফোনে জানালো।

এই মোটরটি ঐ রাস্তায় তিনবার হানা দিয়েছিল। আর কোন গাড়ী ঐ রাস্তায় এতবার যাতায়াত করেনি। তার চেয়েও বড় কথা হোল এই যে, মোটর থেকে একটি বেঁটে লোক নেমে এসে আমার নিযুক্ত লোকটিকে দিয়েই ঐ ইস্তাহারটি ছিঁড়িয়ে ফেলে।

সেই বেঁটে লোকটি হচ্ছে—এই আমাদের সামনে বসে, শ্রীযুত পীরু খাঁ!"

ষোল

সুধীর প্রশ্ন করিল, "তারপর ?"

জিতেন্দ্র কহিতে লাগিল, "কিন্তু ভীষণ ঠকে গেলুম সুধীর! কারণ, মোটর-লাইসেন্স বইখানা হাতিয়ে দেখলুম যে, সেখানে ঐ নম্বরের কোন অস্তিত্বই নেই!

প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হলুম কিন্তু তারপর একটু চিন্তা করে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য মোটরের আরোহী বেশ একটা ভালো ফিকির বের করেছিল। এটা চিন্তা করে বোঝা বিশেষ কষ্টকর নয় যে, মোটরের পেছনে আসল নম্বরের ওপর আর একখানা একই মাপের কালো রংএর টিনের ওপর ঐ ঝুটা নম্বরটা লিখে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যাহোক্ এরপর খবর এলো একটা জুয়েলারের দোকান থেকে। মীনে-ভাঙা একটা আংটি সেখানে নতুন মীনে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে। যে দিয়ে গেছে, তার নাম নাকি সুশীল মজুমদার; কিন্তু স্বর্ণকারের দোকান থেকে ঐ লোকটির অবয়বের পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারলুম যে, এ ব্যক্তি আর কেউ নয়—সেই যে মোটর থেকে নেমে পাগলকে দিয়ে ইস্তাহারটি তুলিয়ে ফেলেছিল,—এ সেই লোক! এখন দেখছি তিনি আর কেউ নন,—তিনি আমাদের পীরু খাঁ!

আমি তো আংটিটা দেখবার জন্য দোকানে ছুটলুম! দোকানে গিয়ে দেখলুম আংটিটা খুব দামী ও তার ওপর

একটা অক্ষর বসানো রয়েছে, 'A'. আমার মনে তৎক্ষণাৎ অমিয়র নামটা সকলের আগে উদয় হলো। অমিয়ের নামের প্রথম অক্ষর 'A', কাজেই এবার যেন বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারলুম যে, অমিয় আগাগোড়াই এ ব্যাপারে জড়িত।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল! ছেলেবেলাকার বন্ধু সে, তার হাতে হাতকড়া লাগাতে হবে ভেবে মনটা খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবলুম, যে অপরাধ করেছে—তার শাস্তি অনিবার্য্য; তাকে শাস্তি পেতেই হবে; হোক না কেন সে আমার বন্ধু? আমি আমার কর্ত্তব্য করে যাবো, বন্ধু বলে তাকে ছেড়ে দিলে আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হবে। সে আমি পারবো না। অতএব অমিয়র বিরুদ্ধে আরো প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় মনোনিবেশ করলুম।

আমার গাড়ীটা এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে হেঁটে বাড়ী ফিরলুম। বুদ্ধু কারণ জিজ্ঞেস করায় বললুম, 'টায়ার ফেটে গেছে, সারাতে দিয়েছি।' আবার তার পরেই বললুম যে আমাকে একবার বজবজ্ যেতে হবে। বুদ্ধদেব মোটরের কথা জিজ্ঞেস করায় বললুম, 'অমিয়রটা চেয়ে নিয়ে যাবো।'

অমিয়র বাড়ীতে এসে তার সাথে দেখা করলুম। আলাপ হোল এবং আমি বজবজে যাওয়ার জন্য গাড়ীখানা চাইলুম। সে সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

আমি যখন তার সাথে আলাপ করছিলুম তখন আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তার হাতের আঙুলগুলোর ওপর।

আমি দেখতে পেলুম—তার হাতে কোন রকম আংটি নেই। কিন্তু ডান হাতের অনামিকার গোড়ায় আংটির একটা দাগ বেশ স্পষ্টই দেখা গেল। অনেকদিন আঙুলে আংটি রাখার পর যদি তা একদিন খুলে ফেলা যায়,

তা'হলে সেখানে যেমন দাগ দেখা যায়, এই দাগও ঠিক সেই রকম! যা'হোক, ঐ দাগটা দেখেই আমি বুঝতে পারলুম যে, অমিয়র আঙুলেই আংটিটি ছিল।

অমিয়র গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিছুদূর এসে রাস্তার ধারে গাড়ীখানা থামিয়ে, পেছনের সিটের সামনে পা রাখবার জায়গাটা বেশ ভালো করে লক্ষ্য করলুম। প্রফেসরের কাটা মুণ্ডুর বাক্সটা যে সেখানেই রাখা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই আমি সে জায়গাটা বেশ করে লক্ষ্য করতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করবার পর পা-পোষের এক জায়গায় একটু রক্তের দাগ দেখতে পেলুম। পকেট থেকে কাঁচি বের করে পা-পোষের সেই রক্তের দাগওয়ালা অংশটুকু কেটে পকেটে পুরলুম। বাড়ীতে এসে পরে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলাম যে ওটা সত্যি-সত্যিই মানুষের রক্তের দাগ! কাটা মাথার বাক্সটা সেখানে ছিল; কাজেই সামান্য একটু রক্তের দাগ তখনো সেখানে লেগে ছিল!

এরপর গেলাম মোটরের পেছনে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলুম যে, যেখানে নম্বরওয়ালা টিনটা লাগানো থাকে সেখানে এমন ভাবে একটা খাঁজ কাটা রয়েছে, যাতে আরো একটা ঐ রকম নম্বরওয়ালা টিন স্বচ্ছন্দে বসানো যেতে পারে। এই সব লক্ষ্য করে অমিয়র অপরাধ সম্পর্কে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না।

তারপর কি করা যায়? বলে এসেছি বজ্‌বজ্‌ যাবো। এখন পর্য্যন্ত বেলা গড়ায়নি—কোথায় যাই? হঠাৎ মনে হোল একবার সলিলের সাথে দেখা করে আসি; ওখানে বসে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

এই ভেবে যখন গাড়ী নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডে সলিলের বাড়ীতে এসে পড়লুম, তখন সূর্য্য হেলে পড়েছে অর্থাৎ সন্ধ্যার আর বড় বেশী বাকী নেই।

সলিলের সাথে দেখা হোল কিন্তু দেখলুম সে বড় চিন্তিত! জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হে, তোমার আবার কি হোল?'

সে উত্তর দিল, 'বেশ একটা ফ্যাসাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছি ভাই! বলা নেই, কওয়া নেই—জীবনের ভয় দেখিয়ে একটা বেনামী চিঠি এসে হাজির!'

আমি বললুম, 'বল কি হে, জীবনের ভয় দেখিয়ে?'

সে বললো, 'দেখোই না চিঠিটা।' এই বলে দেরাজ থেকে চিঠিটা বের করে দিল।

চিঠিটা আমার সাথেই আছে, পড়ে শোনাচ্ছি।" এই বলিয়া জিতেন্দ্র পকেট হইতে সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল,—

"তুমি আমাদের এমন ক্ষতি করিয়াছ যাহার জন্য তোমার জীবন লইতেও আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না!"

একটু থামিয়া জিতেন্দ্র পুনশ্চ কহিতে লাগিল, "ব্যস্, এই পর্য্যন্ত! চিঠিতে নাম, ধাম, গোত্র কিছুই নেই!

আমি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারলুম না। সলিলকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এ চিঠি তুমি পেয়েছ কবে?'

সে বললো, 'আজ ঘুম থেকে উঠে দেখি টেবিলের ওপর পড়ে আছে।'

বললুম, 'কাল রাতে তুমি বাইরে গিয়েছিলে?'

সে বললো, 'না।'

বললুম, 'সন্ধ্যের সময় কোথাও গিয়েছিলে?'

'না।'

'তোমার সাথে কেউ দেখা করতে এসেছিল ?'

সলিল বললে, 'হাঁ, বিকেল বেলায় অমিয় এসেছিল।'

'তোমার সাথে কোন আলাপ হয়েছিল ?'

"হাঁ, হয়েছিল ; কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়। সে মাত্র মিনিট দশেক ছিল। সে এলেই আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি জিতুর কাছে মিথ্যে কথা বলেছ কেন ?'

সে বললে, 'কিসের কথা বলছো ?'

আমি তখন তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললুম। সে তখন খুব জোরে হেসে উঠে বললো, 'তা'হলে তোর কাছে জিতু এসেছিল, আর তুইও তার কাছে সত্যি কথাটা বলে দিলি ?'

আমি বললুম, 'কেন, মিথ্যে বলতে যাবো কেন ?'

সে বললো, 'তা ঠিক। তবে কি জানিস, আমি আজকাল একটু-আধটু জুয়া খেলি ! নেশায় পেয়ে গেছে, আর ছাড়তে পারছি না। সেদিন জুয়া খেলে বাড়ী ফিরছিলুম এম্নি সময় রাস্তায় জিতুর সাথে দেখা। ওকে তো চিনিসই ভাই, সিগ্রেটটা পর্য্যন্ত ছোঁয় না ! যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কোথায় গিয়েছিলুম, তখন আমি তার কাছে আসল কথাটা বলতে সাহস না পেয়ে বললুম যে তোর এখানে এসেছিলুম। যদি সত্যি কথা বলতুম, তা'হলে ও আমাকে কি ভাবতো, বল্‌তো ? এখন দেখ্‌ছি তুই জিতুর কাছে ওকথা বলে বিষয়টা আরো জটিল করে তুলেছিস্ !'

আমি বললুম, 'জটিল কেন হবে ? জিতু এলে তাকে আমি সব বুঝিয়ে বলবো !'

আমার কথা শুনে অমিয় খুশী হোল না। কেমন যেন একটু চিন্তিত হয়ে বাড়ী থেকে চলে গেল ! তারপর আর আমি বাড়ী থেকে বেরোইনি ! ভোরে উঠে দেখি, ঐ

চিঠিখানা টেবিলের ওপর পড়ে আছে! ব্যাপারটা কী বলত জিতু ?'

সলিল চুপ করলো। তখন আমি বললুম, 'ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোমার মৃত্যু আগতপ্রায়! তবে এখন থেকেই সতর্ক হও।'

সলিল একটু ভীত হয়ে বললো, 'পুলিশে খবর দেবো ?'

আমি বললুম, 'একটা কথা সলিল! তুমি কি আমার ওপর নির্ভর করতে পার ?'

সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে বললো, 'পারি।'

আমি বললুম, 'তা হলে তোমার ভয় নেই। আমি যা বলছি শোন। পুলিশে খবর দিতে হবে না; কারণ আমাকে বলা মানেই পুলিশকে বলা। আজকের রাতটা সাবধানে কাটিয়ে দাও। কাল থেকে আমি তোমার পেছনে লোক রাখবো যে তোমায় যে-কোন বিপদ থেকে রক্ষা করতে. পারবে। তুমি কিছু ভাবনা করো না, বা ভয় পেয়ো না। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। পরে তোমায় জানাবো।'

এই বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি রাত পৌনে এগারোটার সময় বাড়ী ফিরলুম। রাত্রি বারোটার সময় আমার সেই 'প্রাইভেট' লোকটির সাথে দেখা করবার কথা ছিল। অতএব আর দেরী করতে পারলুম না।

কেমন, শুনে যাচ্ছো তো সব ?" এই বলিয়া জিতেন্দ্র তাহার সম্মুখের গ্লাস হইতে আবার একটু জল পান করিল।

সতেরো

জিতেন্দ্র আবার আরম্ভ করিল, "আমি পরে বুঝতে পেরেছিলুম যে এটাও অমিয়র কীর্ত্তি! যা'হোক বাড়ীতে এলাম। রাত বারোটার সময় আমার সেই প্রাইভেট লোকটির সাথে দেখা হোল। আমি সলিলের রক্ষার ভারটা তার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম; কারণ, আমি জানি—ও করতে পারে না দুনিয়ায় এমন কাজ নেই! কিন্তু ও যখন বিদেয় নিচ্ছিল তখন আবার একটা কাণ্ড ঘটে গেল! আততায়ী ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। সে কথা পরদিন দুপুর বেলায় তোমাদের দু'জনকেই বলেছি।

এখন আমার মনে এই কথাটি জাগলো যে অমিয়কে তো পাওয়াই গেল,—কিন্তু অন্য আততায়ী দু'জনের কি করা যায়? অমিয়কে ধরে জেরা করে হয়তো তাদের খোঁজ নাও পেতে পারি! অতএব একসাথে যাতে তিন জনকেই ধরা যায়, তারই ব্যবস্থা করা দরকার।

ভাবতে লাগলুম, এ কেমন করে সম্ভব হয়? হঠাৎ আমার মনে হোল যে অপর-দু'জন আততায়ী নিশ্চয়ই মাঝে-মাঝে অমিয়র সাথে দেখা করতে আসে। দিনের বেলায় না গিয়ে রাত্রেই তাদের পক্ষে অমিয়র সাথে দেখা করাটা সম্ভব। সুতরাং আমি যদি রাত্রে অমিয়র বাড়ীর কাছে আত্মগোপন করে থাকি তবে হয়তো অপর দু'জন আততায়ীর দর্শন মিলে যেতে পারে!

সেদিন ছিল কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত। আমি কালো কাপড়ে আত্মগোপন করে রাত বারোটার সময় অমিয়র বাড়ীর কাছে একটা সুরক্ষিত জায়গায় আড্ডা নিলুম।

রাত একটা বেজে গেল। কাউকেই ভেতরে ঢুকতে বা ভেতর থেকে বাইরে বেরুতে দেখলুম না। রাত দেড়টাও বেজে গেল। আশাপ্রদ কিছুই মিল্‌লো না! ভাবলুম, সারা-রাতই এইভাবে কাটিয়ে দেবো। তারপর রাত দু'টোর সময় দেখলুম, বাড়ীর দরজা খুলে গেল এবং সেখান থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো।

লোকটার আকৃতি সেই আগেকার বেঁটে লোকটার মত। আমি তার পিছু নিলুম!

লোকটা বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে যেতে লাগলো। অবশেষে একটা জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট কুটীরের মত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমি বাড়ীটার পাশে এসে কাণ পেতে রইলুম।

লোকটা ভেতরে ঢুকে আর-একজনের সাথে কথা বলতে সুরু করলে। যা বললে তাতে বুঝলুম যে, পরদিন রাত ন'টায় 'মোকামে' অর্থাৎ অমিয়র বাড়ীতে তাদের দু'জনকেই উপস্থিত হতে হবে।

ব্যস্, সুযোগ পেয়ে গেলুম! একসাথে তিন জনকে 'অ্যারেষ্ট' করবার ফিকির মিলে গেল! নিঃশব্দে স্থান পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরলুম।

পরদিনের,—মানে, আজকের ব্যাপারটা বড় মজার! আজ রাত ন'টার সময় পীরু ও মালুর এখানে আসবার কথা। অমিয় তাদের দু'জনকে ডাকিয়েছে শুধু সলিলকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে! সলিলকে অমিয় লোক দিয়ে হত্যা করাবে অথচ

দোষটা যেন ওর ঘাড়ে না পড়ে সেজন্য একটা ভারী মজার কাণ্ড করলে!

ভোর বেলায় আমার বাড়ী গিয়ে সে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললে; তুলে বললে যে তার পিসীমার বড় অসুখ, বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, তাকে এখ্‌খুনি যেতে হচ্ছে। তাই সে আমাকে বলে গেলো!

সাধারণতঃ সে একাজ করে না অর্থাৎ কোথাও যেতে হলে আমাকে বলে যায় না; কিন্তু আজকে বলতে এলো কেন? আমি তো সব বুঝে ফেললুম! মনে-মনে হাসলুম এই মনে করে যে অমিয় বেশ ভাল চালই মারতে যাচ্ছে! আজ সকালে যদি ও বাড়ী চলে যায়, তা'হলে রাত্রে সলিলের হত্যা-ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে না এটা আমাকে জানানোই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে যে মিথ্যে কথা বলছে অর্থাৎ বাড়ী যে সে যাবে না, তা আমি বেশ ভালো করেই জানতুম। সুতরাং আমি তাকে সানন্দে বাড়ী যেতে মত দিলুম। পরে বুদ্ধুকে বললুম যে আজ সাড়ে ন'টার সময় আততায়ীকে ধরবো।

সাড়ে ন'টার কথা বলেছিলুম এইজন্য যে, ন'টার সময় ওরা এখানে আসবে আর অমিয়র সাথে কথাবার্ত্তা শেষ করে রাত একটু গভীর হলে যাবে। কারণ, সলিল যতক্ষণ জেগে আছে, ততক্ষণ তাকে হত্যা করা সোজা নয়। পীরু অবশ্য শীগ্‌গিরই বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সে রাস্তায় আরো দু'তিন ঘণ্টা সময় না কাটিয়ে সলিলের বাড়ীতে ঢুক্‌বার চেষ্টা করতো না। আমার এই হত্যা-সম্পর্কিত রহস্য-উদ্ধারের ইতিহাস এইখানেই শেষ হোল! এর পরে যা ঘটেছে, সে তোমরা দু'জনে বেশ ভালো করেই জান।"

জিতেন্দ্র চুপ করিল।

সুধীর মৌন ভঙ্গ করিয়া কহিল, "তোমার এই রহস্য উদ্ধারের কাহিনীটা অতি চমৎকার লাগলো!"

বুদ্ধদেবের বুক হইতে যেন একখণ্ড ভারী পাথর নামিয়া-গেল! সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ওঃ, কি দারুণ ব্যাপার! আমি তো স্বপ্নেও ধারণা করতে পারিনি যে এটা মিঃ অমিয়র কীর্ত্তি!"

জিতেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "বুঝলে বুদ্ধ, সে সাবেক দিন আর নেই। আজকাল বড়-বড় সহরে যে সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটছে, সেগুলোর মূলে থাকে বড়-বড় মাথাওয়ালা ভদ্রলোক! এরা সব ভদ্রবেশী বোম্বেটে! এদের চাইতে ছোটলোক বোম্বেটে অনেক ভাল। কারণ, তাদের ধরতে এত বেগ পেতে হয় না। কিন্তু এদের ধরা এক অসম্ভব ব্যাপার, জটিল সমস্যা! এরা বুদ্ধিজীবী লোক। এরা মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে খোলস বদলায়। আর সাধারণতঃ পুলিশের ধারণাতেও আসে না যে এই সব ভদ্রলোকের দ্বারা এমন সব কুকাজ সম্পন্ন হচ্ছে! তোমরা তো ধারণাই করতে পারনি যে এত-বড় জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নেতা একজন নামজাদা বিলেত-ফেরৎ ডি. এস্. সি.! আর সেই ডি. এস্. সি. আর কেউ নয়,—সে আমারই বাল্যবন্ধু অমিয়! এ আমারই অদৃষ্টের পরিহাস!

একথাটা যখনই আমি তলিয়ে দেখ্‌ছি, তখনই বুক আমার ভেঙে যায় সুধীর! কারণ, এক্ষেত্রে খুনী যে—অপরাধী যে—সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু! অথচ আজ তারই হাতে আমাকে হাতকড়ি পরিয়ে দিতে হোল! এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নেই।

আজকে যদি অমিয়কে না পেয়ে, আমি অন্য কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে এমন একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডের নেতারূপে

গ্রেপ্তার করতে পারতাম, তাহ'লে যে কত বেশী আনন্দের হোত ব্যাপারটা, তা তোমরা কেউ ধারণা করতে পার বন্ধু ?

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, পরম শত্রুর মত আজ যার সঙ্গে আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে, সে আমারই পরম বন্ধু ! কাজেই, যত কৃতিত্বই আমার থাকুক না কেন, এই কৃতিত্বের মাঝে হাসি নেই—আনন্দ নেই। এই কৃতিত্বের সাথে চিরদিনই মিশে থাকবে আমার বুকের ব্যথা ও চোখের জল।"

আঠারো

জিতেন্দ্র অমিয়র ডায়েরীখানা পড়িতেছিল:

"অনেক চেষ্টার পর মানুষের মগজ ঢুকাইয়া যখন আমি বিড়ালটাকে আমার বশে আনিলাম তখন আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, মানুষের মগজ যদি পশুর মাথায় প্রবেশ করাইয়া পশুকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে পশু মানুষের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারে এবং মানুষের মতই চাল-চলন করিতে শিখে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াই আমি আমার পোষা বিড়ালের মাথায় মানুষের মগজ বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই।

বিড়ালটি তারপর হইতে আমার কথাবার্ত্তা স্পষ্ট বুঝিতে পারিত এবং আমার আদেশ অনুযায়ী কাজ করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিড়ালটি বেশী দিন বাঁচিল না। গবেষণা দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, যে অনুপাতে মানুষের মগজ উহার মাথায় প্রবেশ করানো হইবে, সেই অনুপাতেই উহার মগজ মাথা হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। নতুবা পশুর মৃত্যু অনিবার্য্য।

তারপর আমি একটি বানরের মাথা হইতে মগজ বাহির করিয়া সেই অনুপাতে মানুষের মগজ উহার মাথায় প্রবেশ করাইয়া দিই। কার্য্যটি করিতে আমাকে যে সাবধানতা ও আয়াসের সাহায্য লইতে হইয়াছিল তাহা বিশদ ভাবে লিখিতে হইলে একটি ছোট-খাট বই হইয়া পড়ে! আমি কৃতকার্য্য

হইয়াছিলাম কিন্তু বানরটি আমাকে ছাড়িয়া যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহা আমি আর জানিতে পারিলাম না। হয়তো সে আজও বাঁচিয়া আছে!

সেই হইতে আমার মনে এই ধারণা হইল যে, আমি সার্কাস-পার্টি খুলিব এবং বুদ্ধিমান্ মানুষের মগজ আনিয়া আমার পশুগুলির মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিব।

আমি নিজে হইব 'রিংম্যান্', তারপর পশুগুলিকে দিয়া আমি আমার নিজের ইচ্ছামত কাজ করাইব। আমি যাহা বলিব, পশুগুলি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিবে এবং সেইরূপ কাজ করিবে। এই ভাবে আমার সার্কাস-পার্টি হইবে পৃথিবী-বিখ্যাত। লোকে ভাবিবে আমি পশুকে যাদু করিতে পারি, এবং এইভাবে আমি বিখ্যাত যাদুকর-রূপে পরিগণিত হইব। পৃথিবীর সকল স্থানে এইভাবে সার্কাস-পার্টি লইয়া ঘুরিয়া আমি অগাধ বিত্তের মালিক হইতে পারিব।

এই আশা লইয়া আমি বিদেশ হইতে পশু ক্রয় করিয়া দেশে ফিরিলাম। দেশের গ্রামে এক গুপ্তস্থানে আমার নিযুক্ত লোকের জিম্মায় পশুগুলিকে রাখিয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম।

মগজ সংগ্রহ করিয়াছি, এখন দেশে ফিরিয়া কার্য্যারম্ভ করিব। জানিনা কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব!"

জিতেন্দ্র থামিয়া একটু হাসিল। কহিল, "চমৎকার মৎলব অমিয়! তোমার ডি. এস্. সি. ডিগ্রি জয়যুক্ত হোক! আমাদের বাংলাদেশের নাম অক্ষয় হোক!

আচ্ছা তা' হলে আজকের মত আসি। নমস্কার সুধীর! অমিয়কে আমি তোমারই জিম্মায় রেখে যাচ্ছি।

অমিয়, তোমাকে আর কি বল্‌বো ভাই! বন্ধু হিসাবে

একটা নমস্কার দিচ্ছি, কিন্তু মানুষ হিসাবে নয়; এসো বন্ধু!"
—জিতেন্দ্র ও বন্ধু বিদায় হইল।

একমাস পরের কথা। সেদিন বিচারে মালু ও পীরু খাঁ'র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অমিয়র ফাঁসির হুকুম হইয়া গিয়াছে! জিতেন্দ্র অমিয়র সাথে শেষ দেখা করিয়া আসিয়াছে। সে একটুও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই,—মুখ হইতে শুধু হাসির ভাবটা চলিয়া গিয়াছে।

জিতেন্দ্রকে সে কহিয়াছিল, "আমার কারো ওপর কোন আক্রোশ নেই, জিতু! তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে বলে যাচ্ছি যে, তুমি কর্ত্তব্যে অটল থেকো; তা'হলেই আমার মৃত্যু সার্থক হবে। আমি আমার কৃত পাপের ফল ভোগ করতে যাচ্ছি, সুতরাং আমার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে না।

পাপের ফল ভোগ করতে যাচ্ছিই বা বলি কি করে? আমি তো একরকম মুক্তি পেতেই যাচ্ছি! দুঃখ হয় মালু ও পীরুর জন্য। ওরা তো সারা জীবন কস্ট পাবে। এর চাইতে মৃত্যু ওদের অনেক ভালো ছিল—সাময়িক কষ্টের পর চিরতরে মুক্তি পেতো।

আইন বড় জটিল জিতু! লঘু পাপেরই গুরু শাস্তি, আর আমি যে গুরু পাপ করেছি সেজন্য লঘু শাস্তি দিয়ে আমায় চিরতরে মুক্তি দিচ্ছে! মৃত্যুকে আমি একটুও ভয় করি না। যে মরে, সে সামান্য কস্ট পেয়ে একেবারেই মুক্তি পায়; আর যে থাকে, তার মুক্তিও নেই, কষ্টেরও শেষ নেই!

আমি আমার সম্পত্তি থেকে পিসীমার ভরণ-পোষণ বাবদ যা দরকার তা পিসীমাকে দিয়ে, বাকীটা তোমার হাতে দিয়ে

যাচ্ছি। আমি যাদের ক্ষতি করেছি, তাদের সেই ক্ষতির যদি বিন্দুমাত্রও এ সম্পত্তি দিয়ে পূরণ করতে পারি তবে আমি পরলোক থেকে সুখীই হবো। পিসীমাকে একটা প্রণাম পাঠাতে সাহসী হলুম না। তুমি তাঁকে একটু দেখো।

ভয় নেই, তুমি আমাকে ধরেছ তা পিসীমা জানেন না; জানেন, পুলিশ আমায় ধরেছে। আমার কথা রেখো ভাই!"

জিতেন্দ্রের চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তারপর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে সে যখন বাহির হইল তখন দেখিল—দুনিয়াটা একেবারে ফাঁকা—কোথায়ও কিছুরই অস্তিত্বমাত্র নাই!

এরূপ মরুভূমিময় পৃথিবীর চেহারা সে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই।

শেষ